কিশোর গ্রন্থাবলী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শ্রীমৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

ছবি :
শ্রীঅরুণ সেন,
শ্রীঅশোক ধর

মুদ্রণ :
শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস,
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন,
কলিকাতা-৬

প্রকাশন :
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
ক্যালকাটা পাবলিশার্স,
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

মহালয়া
১৩৬৭

ব্লক তৈরী :
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং,
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
মোহন মুদ্রণী,
২, কার্ত্তিক বসু রোড,
কলিকাতা-৯

গ্রন্থন :
ব্যানার্জী এণ্ড কোং,
১০১, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা-৯

সূচী :

উপন্যাস :

গল্প :

নাটক :

টেনিদা আর সিন্ধুঘোটক

এক

গড়ের মাঠ। সারাটা দিন দারুণ গরম গেছে, হাড়ে-মাংসে যেন আগুনের আলপিন ফুটছিল। এই সন্ধ্যেবেলায় আমি আর টেনিদা গড়ের মাঠে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। কেল্লার এ-ধারটা বেশ নিরিবিলি, অল্প-অল্প আলো-আঁধারি, গঙ্গা থেকে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া।

একটা শুকনো ঘাসের শিস্ চিবুতে চিবুতে টেনিদা বললে, ধ্যেৎ!

—কী হল?

—সব বাজে লাগছে। এমন গরমের ছুটিটা—লোকে আরাম করে সিমলা-শিলং বেড়াতে যাচ্ছে আর আমরা এখানে বসে বসে স্রেফ্ বেগুনপোড়া হচ্ছি। বোগাস্!

—একমণ বরফ কিনে তার ওপর শুয়ে থাকলেই পারো—আমি ওকে উপদেশ দিলুম।

টেনিদা তক্ষুণি হাত বাড়িয়ে বললে, টাকা দে।

—কীসের টাকা?

—বরফ কেনবার।

—আমি টাকা পাব কোথায়?

—টাকা যদি দিতে পারবিনে, তা হলে বুদ্ধি জোগাতে বলেছিল কে র‍্যা?—টেনিদা দাঁত খিঁচোলো বিচ্ছিরিভাবে। ইদিকে গরমের জ্বালায় আমি ব্যাং-পোড়া হয়ে গেলুম আর উনি বসে বসে ধাষ্টামো করছেন।

—এখন গরম কোথায়?—আমি টেনিদাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলুম: কেমন মনোরম রাত, গঙ্গার শীতল বাতাস বইছে—আরো একটু কবিতা করে বললুম: 'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির—'

—নিশির শিশির।—টেনিদা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল: দ্যাখ্ প্যালা ফাজলেমিরও লিমিট্ আছে। এই জষ্টিমাসে শিশির! দেখা দিকিনি, কোথায় তোর শিশির!

ভারী ল্যাঠায় ফেলল তো! এ-রকম কাঠগোঁয়ার বেরসিকের কাছে কবিতা-টবিতা বলতে যাওয়াই বোকামো। আমি অনেকক্ষণ মাথা-টাথা চুলকে শেষে একটু বুদ্ধি করে বললুম, আচ্ছা, কালকে সকালে তোমাকে শিশির দেখাব, মানে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট্ থেকে শিশিরদা-কে ডেকে আনব।

বুদ্ধি করে আগেই সরে গিয়েছিলুম, তাই টেনিদা-র চাঁটিটা আমার কানের পাশ দিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে গেল। টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, তুই আজকাল ভারী ওস্তাদ হয়ে গেছিস। কিন্তু এই আমি তোকে লাস্ট ওয়ার্ণিং দিলুম। ফের যদি গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি করবি, তা হলে এক ঘুষিতে তোকে—

আমি বললুম, ঘুঘুড়িতে উড়িয়ে দেবে!

বদমেজাজী হলে কি হয়, টেনিদা গুণের কদর বোঝে। সঙ্গে সঙ্গে একগাল হেসে ফেলল।

—ঘুষি দিয়ে ঘুঘুড়িতে ওড়ানো। এটা তো বেশ নতুন শোনালো। এর আগে তো কখনো বলিসনি!

আমি চোখ পিট-পিট করে কায়দাসে বললুম, হুঁ—হুঁ—আমি আরো অনেক বলতে পারি। সব এক-সঙ্গে ফাঁস করি না, স্টকে রেখে দিই।

—আচ্ছা, স্টক থেকে আরো দু-চারটে বের কর দিকি।

আমি বললুম, চাঁটি দিয়ে চাটগাঁয় পাঠানো, চিম্‌টি কেটে চিমেশপুরে চালান করা—

—চিমেশপুর? সে আবার কোথায়?

—ঠিক বলতে পারব না। তবে আছে কোথাও নিশ্চয়।

—তোর মুণ্ডু।—টেনিদা হঠাৎ ভাবুকের মতো ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল। খানিকক্ষণ ড্যাব ড্যাব করে আকাশের তারা-টারা দেখল খুব সম্ভব, তারপর করুণ স্বরে বললে, ডাক—ডাক!

—কাকে ডাকব টেনিদা? ভগবানকে?

—আঃ, কচুপোড়া খেলে যা! খামখা ভগবানকে ডাকতে যাবি কেন? আর তোর ডাক শুনতে তো ভগবানের বয়ে গেছে। ডাক ওই আইসক্রীমওলাকে।

আমার সন্দেহ হ'ল।

—পয়সা কে দেবে?

—তুই-ই দিবি। একটু আগেই তো একমণ বরফের ফরমাস করছিলি।

বোকামোর দাম দিতে হ'ল। আইসক্রীম শেষ করে, কাঠিটাকে অনেকক্ষণ ধরে চেটেপুটে পরিষ্কার ক'রে টেনিদা ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে যাচ্ছে, হঠাৎ—ফ্যাচ্।

আমিই হেঁচে ফেললুম। একটা মশা-টশা কী যেন আমার নাকের ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল।

টেনিদা চটে উঠল: এই, হাঁচলি যে?

—হাঁচি পেল।

—পেল? আমি শুতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময়েই তুই হাঁচলি? যদি একটা ভালো-মন্দ হয়ে যায়? মনে কর এই যদি আমার শেষ শোয়া হয়? যদি শুয়েই আমি হার্টফেল করি?

বললুম, অসম্ভব! স্কুল-ফাইনালে তুমি এত বেশি ফেল করেছ যে সব ফেল প্রুফ্ হয়ে গেছ।

টেনিদা বোধহয় এক চাঁটিতে আমাকে চাটগাঁয়ে পাঠানোর জন্যেই উঠে বসতে যাচ্ছিল, ঠিক তক্ষুণি ঘটে গেল ব্যাপারটা।

কে যেন মোটা গলায় বললে, ওঠো হে কম্বলরাম—গেট্ আপ!

আমরা দু-জনেই একসঙ্গে দারুণভাবে চমকে উঠলুম।

দুটো লোক আমাদের দু-পাশে দাঁড়িয়ে। একজন তালগাছের মতো রোগা আর ঢ্যাঙা, এই দারুণ গরমেও তার মাথা-টাথা সব একটা কালো র‍্যাপার দিয়ে জড়ানো। আর একজন ষাঁড়ের মতো জোয়ান, পরনে পেন্টুলুন, গায়ে হাতকাটা গেঞ্জী। তারও নাকের ওপর একটা ফুলকাটা রুমাল বাঁধা আছে।

এবার সেই রোগা লোকটা হাঁড়িচাঁচার মতো চ্যাঁ-চ্যাঁ গলায় বললে, আর পালাতে পারবে না কম্বলরাম, তোমার সব ওস্তাদি এবার খতম। ওঠো বলছি—

টেনিদা হাঁক-পাঁক করে উঠে বসেছিল। দাঁত খিঁচিয়ে বললে, কে মশাইরা এই গরমের ভেতরে এসে খামকা কম্বল-কম্বল বলে চ্যাঁচাচ্ছেন? এখানে কাঁথা কম্বল বলে কেউ নেই। আমরা কী .বলে—ইয়ে—এই গঙ্গার শীতল সমীর-টমীর সেবন করছি, এখন আমাদের ডিস্‌টার্ব করবেন না!

—ও, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি!—ষণ্ডা লোকটা ফস করে প্যান্টের পকেট থেকে কী একটা বের করে বললে, দেখছ?

দেখেই আমার চোখ চড়াং করে কপালে চড়ে গেল। আমি কাঁউ মাউ করে বললুম, পিস্তল!

ঢ্যাঙা লোকটা বললে, আলবৎ পিস্তল! আমার হাতেও একটা রয়েছে। এ দিয়ে কী হয়, জানো? ক্রুম্ করে আওয়াজ বেরোয়—ধাঁ করে গুলি ছোটে, যার গায়ে লাগে সে দেন অ্যাণ্ড দেয়ার দুনিয়া থেকে কেটে পড়ে।

টেনিদার মতো বেপরোয়া লীডারেরও মুখ-টুখ শুকিয়ে প্রায় আলু-কাবলীর মতো হয়ে গেছে, খাঁড়ার মতো লম্বা নাকটা ঝুলে পড়েছে নীচের দিকে। কুক্ষণে বেশ কায়দা করে দু-জনে একটা নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়েছিলুম—আশেপাশে লোকজন কোথাও কেউ নেই। চেঁচিয়ে ডাক ছাড়লে দু-পাঁচজন নিশ্চয় শুনতে পাবে, কিন্তু আমরা আর তাদের বিশেষ কিছু শোনাতে পারব না, তার আগেই দু-দুটো পিস্তলের গুলিতে আমাদের দুনিয়া থেকে কেটে পড়তে হবে! একেবারে দেন্ অ্যাণ্ড দেয়ার!

আমার সেই ছেলেবেলার পিলেটা আবার যেন নতুন করে লাফাতে শুরু করল, কানের ভেতরে যেন ঝিঁঝিঁ পোকারা ঝিঁঝিঁ করতে লাগল, নাকের মধ্যে উচ্চিংড়েরা দাঁড়া নেড়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে এমনি মনে হতে লাগল। ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল অজ্ঞান হয়ে যাই, কিন্তু দু দুটো পিস্তলের ভয়ে কিছুতেই অজ্ঞান হতে পারলুম না।

টেনিদা-ই আবার সাহস করে—বেশ চিনি-মাখানো মোলায়েম গলায় তাদের বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলতে লাগল: দেখুন মশাইরা, আপনারা ভীষণ ভুল করছেন। এখানে কম্বল বলে নেই, কম্বল বলে কাউকে আমরা চিনি না, শীতকালে আমরা কম্বল গায়ে দিই না—লেপের তলায় শুয়ে থাকি। এ হল আমার বন্ধু পটলডাঙার প্যালারাম, আর আমি হচ্ছি শ্রীমান টেনি, মানে—

মোটা লোকটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললে, মানে কম্বলরাম। প্যালারামের

বন্ধু কম্বলরাম—রামে রামে মিলে গেছে। যাকে বলে, রামে এক, রামে দো!
ঘুঁ—ঘুঁ—ঘুঁৎ—

শেষের বিট্‌কেল আওয়াজটা বের করল নাক দিয়ে। হাসল বলে মনে হল। আর সেই বিচ্ছিরি হাসিটা শুনে অত দুঃখের ভেতরেও আমার পিত্তিশুদ্ধ জ্বালা করে উঠল।

সেই ঢ্যাঙা লোকটা খ্যাচম্যাচ করে বললে, কী হাসি মস্করা করছ হে অবলাকান্ত। ফস্ করে একটা পুলিশ-ফুলিশ এসে যাবে, তা হলেই কেলেঙ্কারী। ওদিকে সিন্ধুঘোটক তখন থেকে থাপ খেতে বসে রয়েছে, কম্বলরামকে নিয়ে তাড়াতাড়ি না ফিরলে আমাদের জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে! চলো—চলো। ওঠো হে কম্বলরাম, আর দেরী নয়। গাড়ি রেডিই রয়েছে।

রেডি রয়েছে, তাদের আর সন্দেহ কী! একটু দূরেই দরজাবন্ধ একটা ঘোড়ার গাড়ি ঠায় দাঁড়িয়ে। বুঝতে পারলুম, ওটা কম্বলরামকেই অভ্যর্থনা করবার জন্যে এসেছে।

টেনিদা বললে, দেখুন—বুঝতে পারছেন—

—আমাদের আর বোঝাতে হবে না, সিন্ধুঘোটককেই সব বুঝিয়ো। নাও—চলো—বলেই ঢ্যাঙা লোকটা পিস্তলের নল টেনিদার পিঠে ঠেকিয়ে দিলে।

আর এ অবস্থায় হাত তুলে নির্বিবাদে সুড়সুড় করে হেঁটে যেতে হয়, গোয়েন্দার গল্পের বইতে এই রকমই লেখা আছে। টেনিদা ঠিক তাই করল। আমি সরে পড়ব ভাবছি—দেখি বেঁটে লোকটার পিস্তলের নল আমাকেও খোঁচা দিচ্ছে!

—বারে আমাকে কেন?—আমি ভাঙা গলায় বলতে চেষ্টা করলুম: আমি তো কম্বলরাম নই।

—না, তুমি কম্বলের দোস্ত কাঁথারাম। তোমাকে ছেড়ে দিই, তুমি দৌড়ে পুলিশে খবর দাও—আর ওরা গাড়ি ছুটিয়ে আমাদের ধরে ফেলুক। চালাকি চলবে না, চাঁদ—চলো।

এ অবস্থায় হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্ত পর্যন্ত চলতে বাধ্য হয়, আমি কোন্ ছার! আমরা চললুম, ঘোড়ার গাড়িতে উঠলুম, গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল, আর গাড়ি গড়গড়িয়ে চলতে সুরু করে দিলে।

হায় গঙ্গার শীতল সমীর! বেশ বুঝতে পারলুম, এই আমাদের বারোটা বেজে গেল।

দুই

গাড়িটা বাজে—একদম লক্কড় মার্কা। ছক্কর ছক্কর করে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। কোন্ চুলোয় যে যাচ্ছে বোঝবারও জো নেই। সেই জাঁদরেল অবলাকান্ত প্রায় আমাকে চেপ্টে বসে আছে—ওর নাম যদি অবলাকান্ত হয় তবে বলেন্দ্রনাথের মানে, স্বয়ং সিন্ধুঘোটকের চেহারা যে কেমন হবে কে জানে! দরজা খোলবার জো নেই—এমন কি, কথাটি অবধি কইবার জো নেই। টেনিদা একবার বলতে চেষ্টা করছিল: মশাই, খামখা ভুল লোককে হয়রান করে—

ঢ্যাঙা লোকটা খ্যাঁ খ্যাঁ করে বললে, চোপ!

—যাকে তাকে কম্বলরাম ঠাউরে—

—যাকে তাকে? এমনি খাঁড়ার মতো নাক, এমনি চেহারা—কম্বলরাম ছাড়া আর কারু হয়? কম্বলরামের কোন যমজ ভাই নেই, তিনকুলে তার কেউ আছে বলেও আমরা শুনিনি। ইয়ার্কী?

—স্যার, দয়া করে যদি পটলডাঙায় একটা খবর দেন—

—শাট আপ ইয়োর পটলডাঙা-আলুডাঙা। আর একটা কথা বলেছ কি, এই পিস্তলের এক গুলিতে—

কাজেই আমরা চুপ করে আছি। যা হওয়ার হয়ে যাক। শুধু থেকে থেকে আমার পেটের ভেতর থেকে কেমন গুরগুর করে একটা কান্না উঠে আসছিল। আর কখনো পটলডাঙ্গায় ফিরে যেতে পারব না, আর কোনোদিন পটোল দিয়ে শিঙ্গি মাছের ঝোল খেতে পাব না! টেনিদা-র সঙ্গে আড্ডা দিয়েই আমার এই সর্বনাশ হয়ে গেল। মেজদা ঠিকই বলে, 'ওই টেনিটার চ্যালা হয়েই প্যালা স্রেফ্ গোল্লায় গেল।

আমি তখন বিশ্বাস করিনি। ভাবতুম যে যাই বলুক, টেনিদা একজন সত্যিকারের গ্রেটম্যান। দু-একটা চাটি-টাঁটি লাগায়; জোর করে খাওয়া-টাওয়াও আদায় করে, কিন্তু আসলে তার মেজাজটা ভীষণ ভালো, বিপদ-টিপদ হলে লীডারের মতো বুক ঠুকে সামনে এগিয়ে যায়। কিন্তু সে যে এত মারাত্মক—কম্বলরাম হলেও হতে পারে, আর কোথাকার এক বিট্কেল সিন্ধুঘোটক তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, এ জানলে কে তার ত্রিসীমানায় এগোত।

ওদিকে হঠাৎ অবলাকান্ত খ্যাঁ খ্যাঁ করে হেসে উঠল। বললে, ঘেঁটুদা!

ঘেঁটুদা ওরফে ঢ্যাঙা লোকটা বললে, কী বলছ হে অবলাকান্ত?

—এটা যে কম্বলরাম, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ঘেঁটুদা বললে, আলবাৎ!

অবলাকান্ত বললে, তা না হলে এমন ভোম্বলরাম হয়।

ঘেঁটুদা বললে, নির্ঘাৎ। ভোম্বলরাম বলে ভোম্বলরাম। ওকে কম্বলরামও বলা যেতে পারে।

অবলাকান্ত বললো, ভোম্বলরামও বলা যায়।

—বলেই দু'জনে চ্যাঁ চ্যাঁ আর খ্যাঁ খ্যাঁ করে হেসে উঠল।

আমরা নিজের জ্বালায় মরছি কিন্তু ওদের যে কেন এত হাসি পেল, সে আমি বুঝতে পারলুম না। জুলজুল করে আমি একবার টেনিদার দিকে চেয়ে দেখলুম। গাড়ির ভেতরে ওকে ভালো দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না, কিন্তু যেটুকু দেখলুম তাতে মনে হল রাগে ওর দাঁত কিড়মিড় করছে। নিতান্তই দু-দুটো পিস্তল না থাকলে এতক্ষণে একটা কেলেঙ্কারী হয়ে যেত।

গাড়িটা চলছে তো চলছেই। মাঝে মাঝে গাড়োয়ান এক একবার জিভে টাক্‌রায় এক একটা কটকট আওয়াজ করছে, আর শাঁই শাঁই করে চাবুক হাঁকড়াচ্ছে। গাড়িটার থামবার নামই নেই। একসময় মনে হল, পিচের রাস্তা ছেড়ে খোয়াওঠা পথ ধরল আর থেকে থেকে এক একটা বেয়াড়া ঝাঁকুনিতে পিলেশুদ্ধ্ নড়ে যেতে লাগল।

এতক্ষণ পথের পাশে গাড়ি-টাড়ির আওয়াজ পাচ্ছিলুম, ট্রামের ঘন্টি কানে আসছিল, লোকের গলা পাওয়া যাচ্ছিল, কানে আসছিল রেডিয়ো-টেডিয়োর শব্দ। এখন মনে হল, হঠাৎ যেন সব নিঝুম মেরে গেছে, কোথায় যেন ঝিঁঝি-টিঝি ডাকছে, থেকে থেকে পেঁকো গন্ধ বদ্ধ গাড়ির ভেতরে এসে ঢুকছে। তার মানে উদ্ধারের শেষ আশাটুকুও গেল। এখন আমরা চলেছি সিন্ধুঘোটকের খপ্পরে—কোন্ পোড়োবাড়ীর পাতালে নিয়ে গিয়ে আমাদের দুম করে গুম করে ফেলবে—কে জানে!

হঠাৎ ক্যাব্‌লার কথা মনে পড়ে আমার ভারী রাগ হতে লাগল। ক্যাব্‌লা বলে, 'ওসব গোয়েন্দা গল্প স্রেফ্ গাঁজা—বানিয়ে বানিয়ে লেখে, আমি এক বর্ণও বিশ্বাস করি না।' কিন্তু আজ রাতে সিন্ধুঘোটকের পাল্লায়—

খ্যাড়্—খ্যাড়্—খ্যাড়াৎ

গাড়িটা কাত হয়ে উলটে পড়তে পড়তে সামলে নিলে, মনে হল, কোনো নালা-ফালায় নেমে যাচ্ছিল। আমি একেবারে অবলাকান্তের ঘাড়ে গিয়ে

পড়লুম—সে বললে, উহু-উহু, নাকটা গেল মশাই। ওদিকে ঘেঁটুদার গলা থেকে আওয়াজ বেরুল: ক্যাঁক্—গেলুম!

আর তক্ষুনি টেনিদা বললে, ঘেঁটুচন্দর—এবার? তোমার পিস্তল তো কেড়ে নিয়েছি—আগে তোমার নিকেশ করে ছাড়ব!

আমি চমকে উঠলুম। অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু বুঝতে পরলুম, গাড়িটা কাত হওয়ার ঝাঁকুনিতে টেনিদা সুযোগ পেয়ে ফস করে ঘেঁটুর পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়েছে। একেই বলে লীডার। কিন্তু অবলাকান্তের হাতে তো পিস্তলটা এখনো রয়েছে। টেনিদা না হয় ঘেঁটুকে ম্যানেজ করল, কিন্তু অবলাকান্ত যে এক্ষুনি আমায় সাবাড় করে দেবে।

টেনিদা বললে, ওয়ান-টু-থ্রী। শিগগীর গাড়ির দরজা খোলো, নইলে—

আমি তো কাঠ হয়ে বসে আছি—খালি মনে হচ্ছে, এখুনি আমি গেলুম এইবারে দু দুটো পিস্তলের আওয়াজ—ঘেঁটুচন্দর চিৎ, আমারও বাতচিৎ। চিরতরে ফিনিস্। তারপর রইল টেনিদা আর অবলাকান্ত—কিন্তু মহাযুদ্ধের সেই শেষ অংশটা আমি আর দেখতে পাব না কারণ আমি ততক্ষণে দুনিয়া থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছি।

গোয়েন্দা উপন্যাসে এ-সব জায়গায় একটা দারুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। পড়তে পড়তে লোকের মাথার চুল খাড়া হয়ে যায় অথচ ঘেঁটু আর অবলাকান্ত হঠাৎ চ্যা চ্যা, খ্যা খ্যা করে অট্টহাসি হাসল।

টেনিদা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই অবলাকান্ত বললে, সাবাস কম্বলরাম, তুমি বীর বটে। তোমার বীরত্ব দেখে আমার চন্দ্রগুপ্ত নাটকের পার্ট বলতে ইচ্ছে করছে আলেকজাণ্ডারের মতো—'যাও বীর, মুক্ত তুমি।'

কিন্তু সে আর হওয়ার জো নেই, কারণ আমরা সিন্ধুঘোটকের আস্তানায় ঢুকে পড়েছি।

আর তক্ষুনি থপ করে গাড়িটা থেমে গেল। কোচোয়ান ঘর ঘর করে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বললে, নামো।

টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল: সাবধান, আমি এখুনি গুলি ছুঁড়ব বলে দিচ্ছি—আমার হাতে পিস্তল—

বলতে বলতে গাড়ির ওধারটা খুলে অবলাকান্ত টপ করে নেমে গেল। আর ঘেঁটুদা বললে, থাম্ ছোকরা, বেশি বকিস্ নি। পিস্তল-ফিস্তল ছুঁড়ে আর দরকার নেই, নেবে আয়—

আর এদিক থেকে টেনিদা আর ঘেঁটুদা জড়াজড়ি করতে করতে একসঙ্গে কুমড়োর মতো গড়িয়ে পড়ল গাড়ি থেকে।

আমি দেখলুম, সামনে একটা ভুতুড়ে চেহারার পোড়োমতো পুরনো বাড়ি। তার ভাঙা সিঁড়ির সামনে গাড়ি এসে থেমেছে, চারজন লোক দুটো লণ্ঠন হাতে করে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

একজন হেঁড়ে গলায় বললে, কী ব্যাপার—কুস্তি লড়ছে কে?

টেনিদা ততক্ষণে ধাঁকরে একটা ল্যাং কষিয়ে ঘেঁটুকে উল্টে ফেলে দিয়েছিল। ঘেঁটু গ্যাঙাতে গ্যাঙাতে উঠে দাঁড়ালো, বললে, তোমরা তো বেশ লোক হে! দিব্যি বুঝিয়ে দিলে কম্বলরামটা এক নম্বরের ভীতু, একটু ভয় দেখালেই ভির্মি খেয়ে পড়বে। এ তো দেখছি সমানে লড়ে যাচ্ছে, আবার একটা প্যাচ কষিয়ে আমায় চিৎ করে ফেললে। ইঃ—একগাদা গোবর-টোবর কীসের মধ্যে ফেলে দিয়েছে হে—কী গন্ধ। ওয়াক।

ঠেনিদা চেঁচিয়ে উঠল: হুঁশিয়ার, আমার হাতে তৈরী পিস্তল।

লোক চারটে থমকে দাঁড়িয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। শেষে একজন বললে, পিস্তল। পিস্তল আবার কোত্থেকে এল হে।

অবলাকান্ত বললে, দুত্তোর পিস্তল! সেই যে কম্বলরামকে ভয় দেখাব বলে ফিরিওলার কাছ থেকে আড়াই টাকা দিয়ে দুটো কিনেছিলুম, তারই একটা কেড়ে নিয়েছে আর তখন থেকে শাসাচ্ছে আমাদের।—বলেই আমার হাতে নিজের পিস্তলটা জোর করে গুঁজে দিয়ে বললে, ওহে কম্বলরামের দোস্ত কাঁথারাম, তোমারও গুলি ছোড়বার সাধ হয়েছে নাকি? তা হলে এটা

তোমায় প্রেজেণ্ট করলুম, চার আনার ক্যাপ্ কিনে নিয়ো—আর সারাদিন দুমফটাস্ করে বাড়ির কাক-টাক তাড়িয়ো।

বলে, অবলাকান্ত তো ঘ্যা ঘ্যা করে হাসলই, সেই সঙ্গে গোবরমাখা ঘেঁটুচন্দর, গাড়ির কোচোয়ান আর দুটো লণ্ঠন হাতে চারটে লোক—সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। আর সেই হাসির আওয়াজে পাশের একটা ঝুপসি মতন আমগাছ থেকে গোটা দু-তিন বাদুড় ঝট্পট্ করে উড়ে পালালো।

ঘেঁটু বললে, কই হে কম্বলরাম, গুলি ছুঁড়লে না?

টেনিদা কিছুক্ষণ ঘুগনিদানার মতো মুখ করে চেয়ে রইল, তারপর খেলনা পিস্তলটা তার হাত থেকে টপ করে পড়ে গেল। ইস—ইস—আমরা কী গাড়োল। দুটো লোক আমাদের স্রেফ বোকা বানিয়ে গড়ের মাঠ থেকে ভর সন্ধ্যেবেলায় এমন করে ধরে আনল। আগে জানলে—

কিন্তু পিস্তল-ফিস্তল চুলোয় যাক—এখন আর কিছুই করবার নেই। আমরা দু'জন—কোচোয়ান শুদ্ধু ওরা সাতজন। টেনিদার কুস্তির প্যাঁচ-ট্যাঁচ কোনো কাজে লাগবে না—সোজা চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাবে।

সেই হেঁড়ে গলায় লোকটা বললে, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কতক্ষণ ভ্যারেণ্ডা ভাজবে, হে। রাত তো প্রায় আটটা বাজল। চলো—চলো শিগগীর। সিন্ধুঘোটক তখন থেকে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে।

টেনিদা একবার আমার দিকে তাকালো, আমি টেনিদার দিকে তাকালুম। তারপর—কী আর করা যায়—দু'জনে গুড়গুড় করে এগিয়ে চললুম লোকগুলোর সঙ্গে সঙ্গে।

তিন

কোন্ আদ্যিকালের একটা রদ্দিমাকা বাড়ি—মানুষজন বিশেষ থাকে-টাকে বলে মনে হল না। আস্তরখানা ভাঙা ভাঙা ঘর—কোথাও একটা তেপায়া খাটিয়া, কোথাও বা দু-একখানা ধুলোবালি মাখা টেবিল চেয়ার। দুটো লণ্ঠনের আলোয় ঘরগুলোকে যেমন বিচ্ছিরি, তেমনি ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল। থেকে থেকে মাথার ওপর দিয়ে চামচিকে উড়ে যাচ্ছিল, তাই দেখে আমি শক্ত করে নিজের কান দুটোকে হাতচাপা দিলুম। চামচিকেকে আমার ভীষণ সন্দেহজনক মনে হয়—কেন যে হঠাৎ লোকের ঘরে ঢুকে ফরফর করে উড়তে

থাকে তার কোনো মানেই বোঝা যায় না। ছোড়দি বলে, ওরা নাকি লোকের কান ধরে ঝুলে পড়তে ভীষণ ভালোবাসে। আমার লম্বা লম্বা কান দুটোকে তাই আগে থেকেই সামলে রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ বলেই মনে হল আমার।

এ ঘর থেকে ও ঘর, ও ঘর থেকে সে ঘর। তারপরের ঘরটাই বোধ হয় শ্রীঘর। ভেবেই আমার মনে হল, শ্রীঘর তো থানার হাজতকে বলে। সিন্ধুঘোটক নিশ্চয় পুলিশ নয় যে আমাদের দুম্ করে হাজতে পুরে দেবে।

এদিকে একটা সিঁড়ি বেয়ে আমরা ওপরে উঠছি। খুব বাজে মার্কা সিঁড়ি, রেলিং ভাঙা, ধাপগুলো দাঁত বের করে রয়েছে। ঠিক এমনি একটা বাড়িতেই যত রকম ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়—দস্যুসর্দার চিং চুং বেপরোয়া গোয়েন্দা দিগ্বিজয় রায়কে গুম করে ফেলে, কিংবা কাঞ্চীগড়ের রাজরানী মৃদুলাসুন্দরীর হীরের নেক্‌লেস্ নিয়ে গুণ্ডা হাতীলালের সঙ্গে ওস্তাদ কলিমুদ্দির গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ বেধে যায়। আমার প্রিয় লেখক কুণ্ডু মশাইয়েরও যত সব দুর্ধর্ষ রোমাঞ্চকর কাহিনী একে একে আমার মনে পড়ে যেতে লাগল।

কিন্তু খালি একটা খট্‌কা লাগছে। সে সব গল্পে খেলনা পিস্তলের কথা কোনোদিন পড়িনি।

আবার এসব দারুণ দারুণ ভাবনায় হঠাৎ বাধা পড়ে গেল। সিঁড়ি পেরিয়েই সামনে মস্ত একটা ঘর। তার দরজাটা ভেজানো, কিন্তু ভেতর থেকে একটা জোরালো আলো বাইরে এসে পড়েছে। আমরা সেইখানে থেমে দাঁড়ালুম।

তারপর অবলাকান্ত বেশ মিহি গলায় ডাকল : স্যার!

ভেতর থেকে ব্যাঙের ডাকের মতো আওয়াজ এল : কে?

—আমরা সবাই। মানে কম্বলরাম শুদ্ধু এসে গেছে।

—এসে গেছে? অল্ রাইট্। ভেতরে চলে এসো।

অবলাকান্ত দরজাটা খুলে ফেলল। আর পেছন থেকে লোকগুলো আমাকে আর টেনিদাকে ধাক্কা দিয়ে বললে, যাও—যাও, এবার স্যারের সঙ্গে মোকাবেলা করো।

সবাই আমরা ঘরে পা দিলুম।

বাড়িটা নীচে থেকে যতই খারাপ মনে হোক—এ ঘরটা একেবারে আলাদা। টিমটিমে লণ্ঠন নয়—মেজেতে শোঁ শোঁ করে একটা পেট্রোম্যাক্স বাতি জ্বলছে। মস্ত ফরাসের ওপর ধপধপে সাদা চাদর বিছানো, সেখানে

তিনচারটে তাকিয়া, আর একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে—গড়গড়ার নল মুখে পুরে—

কে ?

কে আর হতে পারে—সিন্ধুঘোটক ছাড়া ?

চেহারা বটে একখানা ! হঠাৎ দেখলে মনে হয় বোধ হয় স্বপ্ন দেখছি, নিজের কানে চিমটি কেটে পরখ করতে ইচ্ছে করে। একটা লোক যে এমন মোটা হতে পারে, এক পিপে আলকাত্‌রায় ডুব দিয়ে উঠে আসার মতো তার যে গায়ের রঙ হতে পারে, মণ চারেক শরীরের ওপর এত ছোট যে একটা মাথা থাকতে পারে, আর ছোট মাথায় যে আরো ছোট এমন দুটো কুঁৎকুঁতে চোখ থাকতে পারে—এ না দেখলে তবুও বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু দেখলে আর কিছুতেই বিশ্বাস করবার জো নেই।

আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম, 'ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস্'—কিন্তু সামলে নিলুম আর সিন্ধুঘোটক ব্যাঙের গলায় গ্যাং গ্যাং করে বললে, বোসো সব, সিট্ ডাউন !

এমন কায়দা করে বললে যে, আমরা যেন সব স্কুলের ছাত্র আর হেডমাষ্টার আমাদের বসতে হুকুম দিচ্ছেন।

ঘেঁটুদা কাউমাউ করে বললে, আমি বসতে পারব না স্যার—এই কম্বলরামটা আমাকে গোবরের ভেতরে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছে। গায়ে দারুণ গন্ধ।

সিন্ধুঘোটক বললে, তুমি একটা থার্ডক্লাস ! আমার ফরাসে গোবর লাগিয়ো না—আগে চান করে এসো। যাও—গেট্ আউট্ !

ঘেঁটুদা তখুনি সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল।

আমরা সবাই তখন ফরাসে বসে পড়েছি। সিন্ধুঘোটক তাকিয়া ছেড়ে পিঠ খাড়া করে উঠে বসল। জিজ্ঞেস করলে, কে কম্বলরাম ?

অবলাকান্ত টেনিদাকে একটা খোঁচা দিয়ে বললে, এইটে।

সিন্ধুঘোটক আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, আর রোগা চিম্‌টে খাড়া-খাড়া কানওলা ওটা কে ?

অবলাকান্ত বললে, নাম জানিনে স্যার। কম্বলরামের দোস্ত—কাঁথারাম বোধ হয়।

হেঁড়ে গলায় লোকটা বললে, সতরঞ্চিরাম হতেও বাধা নেই।

বাকী সবাই একসঙ্গে বললে, হাঁ, সতরঞ্চিরামও হওয়া সম্ভব।

সিন্ধুঘোটক বললে, অর্ডার—অর্ডার !—বলেই আবার গড়গড়ার নলটা মুখে তুলে নিলে। আর এইবার আমি লক্ষ্য করে দেখলুম, গড়গড়ায় কল্‌কে-টল্‌কে কিচ্ছু নেই, শুধু শুধু একটা নল মুখে পুরে সিন্ধুঘোটক বসে আছে।

—তারপর কম্বলরাম—

এতক্ষণ টেনিদা আলু-চচ্চড়ির মতো মুখে করে বসেছিল, এবার গাঁ গাঁ করে উঠল।

—দেখুন স্যার, এরা গোড়া থেকেই ভুল করেছে। আমি তো কম্বলরাম নই-ই, আমাদের সাতপুরুষের মধ্যে কেউ কম্বলরাম নেই। আমি হচ্ছি টেনি শর্মা—ওরফে ভজহরি মুখুজ্জে, আর এ হল প্যালারাম—ওর ভালো নাম স্বর্ণেন্দু ব্যানার্জী। আমরা পটলডাঙায় থাকি। গরমের জ্বালায় অস্থির হয়ে আমরা গঙ্গার স্নিগ্ধ-সমীর সেবন করছিলুম, আপনার ঘেঁটুচন্দর আর অবলাকান্ত গিয়ে আমাদের জোর করে ধরে এনেছে।

শুনে, সিন্ধুঘোটকের মুখ থেকে টপ করে নলটা পড়ে গেল। তিনটে কোলা ব্যাঙের ডাক একসঙ্গে গলায় মিশিয়ে সিন্ধুঘোটক প্রায় হাহাকার করে উঠল : ওহে অবলাকান্ত, এরা কী বলে ?

অবলাকান্ত ব্যস্ত হয়ে বললে, বাজে কথা বলছে স্যার। এই কম্বলরামটা দারুণ খলিফা—তখন থেকে আমাদের সমানে ভোগাচ্ছে। আপনিই ভালো করে দেখুন না, স্যার। কম্বলরাম ছাড়া এমন চেহারা কারুর হয় ? এমন লম্বা তাগড়াই চেহারা, এমন একখানা মৈনাকের মতো খাড়া নাক, এমনি তোবড়ানো চোয়াল—

—দাঁড়াও—দাঁড়াও !—সিন্ধুঘোটক হঠাৎ তার ছোট্ট মাথা আর কুঁৎকুঁতে চোখ দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলে : কিন্তু কম্বলরামের নাকের পাশে যে একটা কালো জড়ুল ছিল, সেটা কোথায় ?

সঙ্গে সঙ্গে বাকী লোকগুলো সবাই ঝুঁকে পড়ল টেনিদার মুখের ওপর : তাই তো, জড়ুলটা কোথায় ?

টেনিদা খ্যাচম্যাচ করে বললে, আমি কি কম্বলরাম যে জড়ুল থাকবে ? এইবার আপনারাই বলুন তো মশাই, এই দারুণ গ্রীষ্মের সন্ধ্যেবেলায় খামখা দুটো ভদ্রসন্তানকে হয়রান করে আপনাদের কী লাভ হল ?

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর সিন্ধুঘোটক ডাকল : অবলাকান্ত !

—বলুন স্যার !

—এটা কী হল ?

—আজ্ঞে, অন্ধকারে স্যার—ভালো করে ঠাওর পাইনি।—মাথা চুলকোতে চুলকোতে অবলাকান্ত বললে, কিন্তু আমার মনে হয় স্যার, এটাই কম্বলরাম। চালাকি করে জড়ুলটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।

—শাট্ আপ। জড়ুল কি একটা মার্বেল যে ফস করে লুকিয়ে ফেলা যায় ?

—যদি অপারেশন করায় ?

—হুঁ। সে একটা কথা বটে।—সিন্ধুঘোটক আবার নলটা তুলে নিলে : কিন্তু অপারেশনের দাগ তো থাকবে।

—নাও থাকতে পারে স্যার। আজকাল ডাক্তারদের অসাধ্য কাজ নেই।

টেনিদা কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দোরগোড়া থেকে কোচোয়ান বললে, হুজুর, আমার একটা নিবেদন আছে।

—বলে ফেলো পাঁচকড়ি। আউট্ উইথ্ ইট।

—কম্বলরামকে আমি চিনি, স্যার। রোজ বিকেলে মনুমেণ্টের নীচে আমরা খৈনি খাই। সে কলকাতায় নেই, আজ দুপুরবেলায় রেলে চেপে তার মামাবাড়ি বাঁকুড়া চলে গেছে।

শুনে, অবলাকান্ত তড়াং করে লাফিয়ে উঠল। পাঁচকড়িকে এই মারে তো সেই মারে !

—তবে এতক্ষণ বলিসনি কেন হতভাগা বুদ্ধু কোথাকার ? খামখা আমাদের খাটিয়ে মারলি ?

—বলে কী হবে ? আমার কথা তো কেউ বিশ্বেস করে না !—বলে, ভারী নিশ্চিন্ত মনে পাঁচকড়ি হাতের মুঠোয় খৈনি ডলতে লাগল আর গুনগুনিয়ে গান ধরল : 'বনে চলে সিয়ারাম, পিছে লছ্‌মন ভাই—'

সিন্ধুঘোটক বললে, অর্ডার, অর্ডার ! পাঁচকড়ি, নো সিংগিং নাউ ! কিন্তু এ পরিস্থিতিতে কী করা যায় ?

অবলাকান্ত প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে রইল। আর বাকী সবাই একসঙ্গে বললে, তাই তো, কী করা যায়।

টেনিদা বললে, কিছুই করবার দরকার নেই স্যার। বেশ রাত হয়েছে, আমাদের তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিন, নইলে বাড়িতে গিয়ে বকুনি খেতে হবে।

সিন্ধুঘোটক কিছুক্ষণ খালি খালি গড়গড়া টানতে লাগল। কলকে-টলকে কিচ্ছু নেই, শুধু গড়গড়ার ভেতর থেকে উঠতে লাগল জলের গুড়গুড় আওয়াজ।

তারপর সিন্ধুঘোটক বললে, হয়েছে।

অবলাকান্ত ছাড়া বাকী সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, কী হয়েছে?

—প্ল্যান। কম্বলরাম যখন নেই, তখন একে দিয়েই কাজ চালাতে হবে। নাকের নীচে একটা জড়ুল দিলেই ব্যাস্—কেউ আর চিনতে পারবে না।

অবলাকান্ত ভারী খুশি হয়ে হাত কচলাতে লাগল: আমিও তো স্যার সেই কথাই বলছিলুম।

হায়—হায়, ঘাটে এসে শেষে নৌকো ডুবল! এতক্ষণ বেশ আরাম বোধ করছিলুম, কিন্তু সিন্ধুঘোটকের কথায় একেবারে 'ধুক্ করে নিভে গেল বুকভরা আশা।' টেনিদার দিকে চেয়ে দেখলুম, ওর মুখখানা যেন ফজলি আমের মতো লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে।

টেনিদা শেষ চেষ্টা করল: স্যার, আমাদের আর মিথ্যে হ্যারাস্ করবেন না। ভুল যখন বুঝেইছেন—

সিন্ধুঘোটক এবার কুঁৎকুঁতে চোখ মেলে টেনিদার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকটা। কী ভেবে মিনিট খানেক খ্যাক খ্যাক করে হাসল, তারপর বললে, আচ্ছা ছোকরারা, তোমরা আমাদের কী ভেবেছ বলো দেখি? রাক্ষস? খপ করে খেয়ে ফেলব?

ভাবলে অন্যায় হয় না—অন্ততঃ সিন্ধুঘোটকের চেহারা দেখলে সেই রকমই সন্দেহ হয়। এতক্ষণে আমি বললুম, আমরা কিছুই ভাবছি না স্যার, কিন্তু বাড়ি ফিরতে আর দেরী হলে বড়দা আমার কান ধরে—

—হ্যাং ইয়োর বড়দা!—সিন্ধুঘোটক বিরক্ত হয়ে বললে, তোমার কানদুটো এমনিতেই বেশ বড়ো রয়েছে, একটু ছাঁটাই করে দিলে নেহাৎ মন্দ হবে না। ও-সব বাজে কথা রাখো। তোমাদের দিয়ে আজ রাতে আমরা একটা মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চাই। যদি সফল হই—তোমাদের খুশি করে রিওয়াড দেব!

—মহৎ উদ্দেশ্য!—টেনিদা চিড়বিড় করে উঠল: এইভাবে ভদ্দর লোকদের পথ থেকে পাকড়াও করে এনে কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে স্যার?

সিন্ধুঘোটক চটে বললে, চোপরাও! এই বাড়ির পেছনে একটা পচা ডোবা আছে, তাতে কিলবিল করছে জোঁক। বেশি চালাকি করো তো দুজনকে আধঘণ্টা তার মধ্যে চুবিয়ে রাখব!

শুনে আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল! জোঁক আমি কখনো দেখিনি, কিন্তু

তারা কী করে কুটুস্ করে মানুষকে কামড়ে ধরে আর নিঃশব্দে রক্ত শুষে খায়, তার ভয়াবহ বিবরণ অনেক শুনেছি। তা থেকে জানি, আর যাই হোক, জোঁকের সঙ্গে কখনো 'জোক' চলে না!

টেনিদা হাউ হাউ করে বললে, না স্যার, জোঁক নয়, জোঁক নয়! ওরা খুব বাজে জিনিস।

—তাহলে আমার প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাও।

—কী করতে হবে স্যার?

—বেশি কিছু নয়। শুধু একজনের পকেট থেকে একটা কৌটো তুলে আনতে হবে। আর সে-কাজ কম্বলরাম ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না।

—কীসের কৌটো স্যার?

—জার্মান সিল্ভারের।

—কী আছে তাতে?—টেনিদা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল: হীরে মুক্তা-মানিক? কোহিনুর? নাকি আরো আরো দামী, আরো দুর্মূল্য কোনো দুর্লভ রত্ন?

সিন্ধুঘোটক গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নামিয়ে কিছুক্ষণ প্যাট্ প্যাট্ করে চেয়ে রইল। তারপর বিষম বিরক্ত হয়ে বললে, ধেৎ, হীরে মুক্তো কোত্থেকে আসবে? অত সস্তা নাকি?

—তবে কী আছে স্যার? কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গোপন ফরমুলা?

—নাঃ, ও-সব কিচ্ছু নয়।—চিরতা-খাওয়ার মতো তেতো মুখ করে সিন্ধুঘোটক বললে, কৌটোয় কী আছে জানো? নস্যি, এক নম্বরের কড়া নস্যি। তার দাম দু পয়সা কিংবা চার পয়সা!

—অ্যাঃ! সেই কৌটোর জন্যে—

সিন্ধুঘোটক বললে, শাট্ আপ্! এর বেশি আর জানতে চেয়ো না এখন। ওহে অবলাকান্ত, এই নকল কম্বলরামকে এবার নিয়ে যাও—কাঁথারামকেও ছেড়ো না। মেক-আপ করে দশ মিনিটের মধ্যে রেডি করে ফেলো।

আর একবার মনে হল, জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি? তক্ষুণি নিজের গায়ে একটা চিমটি কেটে আমি চমকে উঠলুম, আর কে যেন আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললে, চলো রাদার—আর দেরী নয়!

চার

যেতে হল পাশের একটা ছোট ঘরে।

সঙ্গে এল অবলাকান্ত, পাঁচকড়ি কোচম্যান আর হেঁড়ে-গলার সেই লোকটা। দেখলুম ঘরে একটা আয়না রয়েছে, আর থিয়েটারের সময় যে-সব রং-টং মাখে তাও রয়েছে একগাদা। এমন কি কয়েকটা পরচুলো, নকল গোঁফ এ-সবও আমি দেখতে পেলুম।

কিন্তু মানে কী এ-সবের?

টেনিদা বললে, আপনারা কী চান স্যার? মৎলব কী আপনাদের?

—আমাদের মৎলব তো সিন্ধুঘোটকের কাছ থেকেই শুনেছ।—সেই হেঁড়ে গলার লোকটা ফস করে টেনিদার মুখে আঠার মতো কী খানিকটা মাখিয়ে দিয়ে বললে, একটা নস্যির কৌটো পাচার করতে হবে।

—কার নস্যির কৌটো?

—বিজয়কুমারের।

—কে বিজয়কুমার?

—নামজাদা ফিল্মস্টার বিজয়কুমার।

অভিনেতা বিজয়কুমার। শুনে আমি একটা খাবি খেলুম। কী সর্বনাশ—তিনি যে একজন নিদারুণ লোক! তাঁর কত ফিলিম দেখতে দেখতে আমার মাথার চুল স্রেফ আলপিনের মতো খাড়া হয়ে উঠেছে। ভদ্রলোকের অসাধ্য কাজ নেই। এই সুন্দরবনের জঙ্গলে ধড়াম ধড়াম করে দুটো বাঘ আর তিনটে কুমীর মেরে ফেললেন, এই একটা মোটরবাইকে চড়ে পাঁই পাঁই করে অ্যায়সা ছুট লাগালেন যে, দুরন্ত দস্যুদল ঝড়ের বেগে মোটর ছুটিয়েও তাঁকে ধরতে পারলে না। কখনো বা দারুণ বৃষ্টির ভেতরে বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে করুণ সুরে গান গাইতে লাগলেন (অত বৃষ্টিতে ভিজেও ওঁর সর্দি হয় না আর কী জোরালো গলায় গান গাইতে পারেন)! আবার কখনো-বা ভারী নরম গলায় কী সব বলতে বলতে, হলশুদ্ধু সবাইকে কাঁদিয়ে দিয়ে ফস্ করে চলে গেলেন। মানে, ভদ্রলোক কী যে পারেন না, তাই-ই আমার জানা নেই।

এ হেন বিজয়কুমারের নস্যির কৌটো লোপাট করতে হবে। সেই কৌটোর দাম বড়ো জোর আট আনা, তাতে খুব বেশি হলে দু'আনার কড়া নস্যি। হীরে নয়, মুক্তো নয়, সোনা-দানা নয়, ঘোরতর দস্যু ডাকাত

ক্যাডাভ্যারাসের দুরন্ত মরণ-রশ্মির রহস্যও নয়। এরই জন্যে এত কাণ্ড। কোত্থেকে এক বিদ্‌ঘুটে সিন্ধুঘোটক, সন্ধ্যেবেলায় গড়ের মাঠে দুটো বিটকেল লোক—অবলাকান্ত আর ঘেঁটুদা দুটো খেল্‌না পিস্তল নিয়ে হাজির, একটা লক্কড় ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে আমাদের লোপাট করা, ভূতুড়ে পোড়ো বাড়ি, টেনিদাকে কম্বলরাম আর আমাকে কাঁথারাম সাজানো। এ সব ধাষ্টামোর মানে কী?

লোকগুলো ফসফস করে আঠাফাটা দিয়ে আমার মুখে খানিকটা যাচ্ছেতাই গোঁফ দাড়ি লাগিয়ে দিলে তা থেকে আবার শুঁটকো চামচিকের মতো কী রকম যেন বিচ্ছিরি গন্ধ আসছিল। আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের চেহারা দেখে আমার তাক লেগে গেল—ঠিক আমাদের পাড়ার হ্যাদাপাগলের মতো দেখাচ্ছে—যে লোকটা হাঁটু অবধি একটা খাকি শার্ট ঝুলিয়ে গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা পরে, হাতে একটা ভাঙা লাঠি নিয়ে মাঝে মাঝে রাস্তায় ট্রাফিক কন্ট্রোল করতে চেষ্টা করে। আর টেনিদার মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা তিন চারদিনের না-কামানো দাড়ি, নাকের পাশে ইয়া বড়া এক কটকটে জড়ুল।

আমি কাঁথারাম কিংবা হ্যাদাপাগলা যাই হই, টেনিদা যে মোক্ষম একটি কম্বলরাম, তাতে আমার আর এতটুকু সন্দেহ রইল না। এমন কি একথাও মনে হতে লাগল যে আসলে টেনিদা ছদ্মবেশী কম্বলরাম ছাড়া আর কিছুই নয়! কিন্তু সব মিলিয়ে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? এ সব সাজগোজ ক'রে আমরা যাব কোথায়, আর এই রাতে? এই পোড়োবাড়িতে, ফিল্মস্টার বিজয়কুমারের পকেটটাই বা পাওয়া যাবে কোথায় যে, আমরা ফস করে তা থেকে নস্যির কৌটো লোপাট করে দেব?

আমি মুখ কাঁচুমাচু করে বললুম, বিজয়কুমার কোথায় আছেন স্যার?

যে লোকটা আমার মুখে দাড়িগোঁফ লাগাচ্ছিল, সে বললে, আছে কাছাকাছি কোথাও। সময় হলেই জানতে পারবে।

—কিন্তু তাঁর পকেট মারবার জন্যে আমাদের ধরে আনা কেন?—টেনিদা গোঁ গোঁ করে বললে, আমরা ও সব কাজ কোনোদিন করিনি। আমরা ভালো ছেলে—কলেজে পড়ি।

আর একজন বললে, থামো হে কম্বলরাম, বেশি ফটফট কোরো না। তোমার গুণের কথা কে জানে না, তাই শুনি? বলি, বিজয়কুমারের খাস

চাকর হিসেবে তার পকেট থেকে রোজ পয়সা হাতাও নি তুমি? হু'বার সে তোমায় বলেনি,—এই ব্যাটা কম্বল, তোর জ্বালায় আর পারি না—তুই আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা? নেহাৎ কান্নাকাটি করেছিলে বলে আর তোমার রান্না মোগলাইকারী না হলে বিজয়কুমারের খাওয়া হয় না বলেই তোমার চাকরিটা থেকে যায়নি? তুমি বলতে চাও, এগুলো সব মিথ্যে কথা?

টেনিদা ঘোঁৎ ঘোঁৎ বললে, কেন বারবার বাজে কথা বলছেন? আমি কম্বলরাম নই।

—এতক্ষণ ছিলে না। কিন্তু এখন আর সে কথা বলবার জো নেই। শ্রীমান কম্বলরাম নিজে সামনে এসে দাঁড়ালেও এখন ফয়শালা করা শক্ত হবে কে আসল আর কে নকল! বুঝলে ছোকরা, আমার হাতের কাজই আলাদা। টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত যত থিয়েটার হয় তাদের কোনো মেক-আপম্যান আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। তোমাকে যা সাজিয়েছি না,—চোখ থাকলে তার কদর বুঝতে?

—কদর বুঝে আর দরকার নেই। এখন বলুন, আমাদের এই সং সাজিয়ে আপনাদের কী লাভ হচ্ছে।

—এত কষ্ট করে তোমাকে কম্বলরাম বানালুম, আর তুমি বলছ সং!—লোকটা ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: মনে ভারী ব্যথা পেলুম হে ছোকরা, ভারী ব্যথা পেলুম। নাও, চলো এখন সিন্ধুঘোটকের কাছে। তিনিই বলে দেবেন, কী করতে হবে।

আবার সুড়সুড় করে দোতলায় যেতে হল আমাদের। কথা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই—সে তো বোঝাই যাচ্ছে। শুধু এইটেই বোঝা যাচ্ছে না যে, বিজয়কুমারের পকেট হাতড়াবার জন্যে আমাদের ধরে আনা কেন? ও তো সিন্ধুঘোটকের দলের যে কেউ করতে পারত—লোকগুলোকে দেখলেই ছ্যাঁচড়া আর গাঁটকাটা বলে সন্দেহ হয়।

তা ছাড়া পকেট মারতে গিয়ে যদি ধরা পড়ি—

ধরা পড়লে কী হবে তা অবিশ্যি বলবার দরকার নেই। তখন রাস্তাশুদ্ধু লোক একেবারে পাইকারী হারে কিলোতে আরম্ভ করবে। হিতোপদেশের সেই কীলোৎপাটীত বানরঃ—অর্থাৎ কিনা কিলের চোটে দাঁতের পাটি-ফাটি সব উপড়ে যাবে আমাদের।

কিন্তু কাজটা বোধ হয় টেনিদা—ওরফে কম্বলরামকেই করতে হবে, কাজেই কিলচড় আমার বরাতে না-ও জুটতে পারে। তা ছাড়া টেনিদার ঠ্যাং দুটোও বেশ লম্বা লম্বা—বেগতিক বুঝলে তিনলাফে এক মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে পারে। দেখাই যাক না—কী হয়।

আর সত্যি বলতে কি, এতক্ষণে আমারও কেমন একটা উত্তেজনা হচ্ছিল। কলকাতায় এই দারুণ গরম—চটচটে ঘাম আর রাত্তিরে বিচ্ছিরি গুমোট—সব মিলে মন মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এমন কি, গঙ্গার ধারের শীতল সমীরেও যে খুব আরাম হচ্ছিল তা নয়। তারপরেই ঘেঁটুদা আর অবলাকান্ত এসে হাজির। দিব্যি জমে উঠেছিল, বিরাট একটা সিন্ধুঘোটক ছিল, বেশ একটা ভীষণ রকমের কিছু রোমাঞ্চকর ব্যাপার ঘটবে এমনি হচ্ছিল, কিন্তু একটা নস্যির কৌটোতেই সব গোলমাল করে দিচ্ছে। একটা হীরে মুক্তো হলেও ব্যাপারটা কিছু বোঝা যেত, কিন্তু—

সিন্ধুঘোটক সমানে গড়গড়া টানছে—আশ্চর্য, কল্‌কে যে নেই সেটা কি ওর খেয়ালই হয় না? নাকি, বিনা কলকেতেই গড়গড়া খাওয়াই ওর অভ্যেস। কে জানে!

আমরা ঘরে যেতেই সিন্ধুঘোটক কটমট করে তাকালো আমার দিকে।

—এটা আবার কে? কোন্ পাগলা-গারদ থেকে একে ধরে আনলে?

—আজ্ঞে, পাগলা-গারদের আসামী নয়, ও কাঁথারাম।

—ওটাকে সাজাতে গেলে কেন?

—এমনি একটু হাত-মকশো করলুম, আজ্ঞে!—যে আমার মুখে বাবু গোঁফদাড়ি লাগিয়ে দিয়েছিল, সে একগাল হেসে জবাব দিলে।

—কম্বলরামটা খাসা হয়েছে। হাঁ—নিখুঁত।—সিন্ধুঘোটক গড়গড়া রেখে উঠে দাঁড়ালো, তারপর এগিয়ে এল আমাদের দিকে। ঠিক যেন শুঁড়কাটা একটা হাতি দু-পায়ে এগিয়ে এল দুলতে দুলতে।

প্রথমেই টেনিদার নাকটা নেড়ে চেড়ে দেখল, তারপর আঙুল দিয়ে জড়ুলটা পরখ করল, তারপর একটা কান ধরে একটু টানল। টেনিদার মুখটা রাগের চোটে ঠিক একটা বেগুনের মতো হয়ে যাচ্ছিল—এ আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম। কিন্তু কিচ্ছু করবার জো নেই—অনেকগুলো লোক রয়েছে চারপাশে, টেনিদা শুধু গোঁ গোঁ করতে লাগল।

—কান ধরছেন কেন, স্যার?

—কেন, অপমান হল নাকি ?—সিন্ধুঘোটক একরাশ দাঁত বের করে খ্যাক-খ্যাক্-খ্যাক্ করে হেসে উঠল : ওহে, মজার কথা শুনেছ ? কম্বলরামের অপমান হচ্ছে !

ঘরশুদ্ধু লোক অমনি একসঙ্গে ঘোঁক ঘোঁক করে হেসে উঠল। সব চাইতে বেশি করে হাসল ঘেঁটুদা, টেনিদা যাকে ল্যাং মেরে গোবরের ভেতরে ফেলে দিয়েছিল।

হাসি থামলে সিন্ধুঘোটক বললে, যাক—আর সময় নষ্ট করে দরকার নেই। এবার অ্যাক্শন !

—অ্যাক্শন !—শুনেই আমার পিলে-টিলে কেমন চমকে উঠল, আমি টেনিদার দিকে চাইলুম। দেখলুম, খাঁড়ার মতো নাকটা যেন অনেকখানি খাড়া হয়ে উঠেছে, রাগে চোখ দুটো দিয়ে আগুন ছুটছে !

পাঁচ

সেই বাড়ি থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লুম আবার। এবার আর ঘোড়ার গাড়িতে নয়, স্রেফ পাঁওদলে। আমাদের ঘিরে ঘিরে চলল আরো জনসাতেক লোক।

রাস্তাটা এব্ড়ো-খেব্ড়ো—দূরে দূরে মিটমিটিয়ে আলো জ্বলছে। পথের ধারে কাঁচা ড্রেন, কচুরিপানা, ঝোপজঙ্গল, কতগুলো ছাড়া ছাড়া বাড়ি, কয়েকটা ঠেলাগাড়িও পড়ে আছে এদিক-ওদিক। দু'জন লোক আসছিল—ভাবলুম চেঁচিয়ে উঠি, কিন্তু তক্ষুনি আমার কানের কাছে কে যেন ফ্যাস ফ্যাস করে বন-বেড়ালের মতো বললে, এই ছোক্‌রা, একেবারে স্পীকটি নট্! চেঁচিয়েছিস কি তক্ষুনি মরেছিস এবার খেল্‌না পিস্তল নয়—সঙ্গে ছোরা আছে!

লোক দুটো বোধ হয় কুলি-টুলি হবে, যেতে যেতে কটমটিয়ে কয়েকবার চেয়ে দেখল আমাদের দিকে। আমি প্রায় ভাঙ্গা গলায় বলতে যাচ্ছিলুম—'বাঁচাও ভাই সব—' কিন্তু ছোরার ভয়ে নিজের আর্তনাদটাকে কোঁৎ করে গিলে ফেলতে হল।

এর মধ্যে টেনিদা একবার আমার হাতে চিম্‌টি কাটল। যেন বলতে চাইল, এই—চুপ করে থাক।

হঠাৎ লোকগুলো আর একটা ছোট রাস্তার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো। একজন সেই রাস্তা বরাবর আঙুল বাড়িয়ে বললে, দেখতে পাচ্ছ?

আমরা দেখতে পেলুম।

রাস্তাটা বেশি দূর যায় নি—দু-পাশে কয়েকটা ঘুমিয়ে পড়া টিনের ঘর রেখে আন্দাজ দুশো গজ দূরে গিয়ে থমকে গেছে? সেখানে একটা মস্তবড় লোহার ফটক, তাতে জোরালো ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বলছে আর ফটকের মাথার ওপর লেখা রয়েছে: 'জয় মা তারা স্টুডিয়ো।'

ঘেঁটুদা বললে, চলে যাও—ওইখানেই তোমাদের কাজ। এই কাঁথারামকেও সঙ্গে নিয়ো—নস্যির কৌটোটা বিজয়কুমারের পকেট থেকে লোপাট করে এর হাতে দেবে তারপর যেমন গিয়েছিলে—সুট্ করে বেরিয়ে আসবে। ব্যাস, তা হলেই কাজ হাঁসিল। তারপরেই তোমাদের হাত ভরে প্রাইজ দেবে সিন্ধুঘোটক।

—কিন্তু একটা নস্যির কৌটোর জন্যে—আমি গজগজ করে বলে উঠলুম।

—নিশ্চয় নিদারুণ রহস্য আছে!—ঘেঁটুদা আবার বললে: কিন্তু তা

জেনে তোমাদের কোনো দরকার নেই। এখন যা বলছি, তাই করো। সাবধান—স্টুডিয়োর ভেতরে গিয়ে যদি কোনো কথা ফাঁস করে দাও, কিংবা পালাতে চেষ্টা করো, তা হলে কিন্তু নিদারুণ বিপদে পড়বে। সিন্ধুঘোটকের নজরে পড়লে একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত লুকিয়ে বাঁচতে পারে না, সেটা খেয়াল রেখো।

টেনিদা বললে, খেয়াল থাকবে।

ঘেঁটুদা আবার বললে, আমরা সব এখানেই রইলুম। দারোয়ান বিজয়কুমারের পেয়ারের চাকর কম্বলরামকে চেনে—তোমাকে বাধা দেবে না। আর তুমি কাঁথারামকেও নিজের ভাই বলে চালিয়ে দেবে। গেট দিয়ে ঢুকে একটু এগিয়েই দেখবে গুদামের মতো প্রকাণ্ড একটা টিনের ঘর—তার উপর লেখা রয়েছে ইংরিজিতে—২। ওটাই হচ্ছে দু' নম্বর ফ্লোর, ওখানেই বিজয়কুমারের শুটিং হচ্ছে।

—ফ্লোর! শুটিং এ সব আবার কী ব্যাপার?—টেনিদা ঘাবড়ে গিয়ে জানতে চাইল: ওখানে আবার গুলিগোলার কোন ব্যাপার আছে নাকি?

—আরে না—না, ও সমস্ত কোনো ঝামেলা নেই। বললুম তো, ফ্লোর হচ্ছে গুদামের মতো এক রকমের ঘর, ওখানে নানারকম দৃশ্য-টৃশ্য তৈরী করে সেখানে ফিলিম তোলা হয়। আর শুটিং হল গিয়ে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা—কাউকে গুলি করার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই!

—বুঝতে পারলুম। আচ্ছা—দু'নম্বর ফ্লোরে না হয় গেলুম—সেখানে না হয় দেখলুম, বিজয়কুমারের শুটিং হচ্ছে—তখন কী করব?

—সুযোগ বুঝে তার কাছে গুটি গুটি এগিয়ে যাবে। সে হয়তো জিজ্ঞেস করবে, কী রে কম্বলে, দেশে গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে চলে এলি যে? আর স্টুডিয়োতেই এলি কেন? উত্তরে তুমি বলবে, 'কী করব স্যার—দেশের বাড়িতে গিয়েই আপনার সম্পোকে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখলুম—মেজাজ খিঁচড়ে গেল এজ্ঞে, তাই চলে এলুম। শুনলুম আপনি স্টুডিয়োতে এয়েচেন, তাই দর্শন করে চক্ষু সাথ্থক করে গেলুম।' শুনে বিজয়কুমার হয়তো হেসে বলবে, 'ব্যাটা তো মহা খলিফা'—বলে তোমার পিঠে চাপড়ে দেবে, আর একটা টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বলবে, নে—কিছু মিষ্টি-ফিষ্টি খেয়ে বাড়ি চলে যা। আমার ফিরতে রাত হবে, পারিস তো ভালো দেখে একটা মুরগীর

রোস্ট্ করে রাখিস।' যখন এইসব কথা বলতে থাকবে, তখন সেই ফাঁকে তুমি চট করে তার পকেট থেকে নস্যির ডিবেটা তুলে নেবে।

—যদি ধরা পড়ে যাই ?

—বলবে, পকেট মারিনি স্যার, একটা পিঁপড়ে উঠেছে, তাই ঝাড়ছিলুম।

—যদি বিশ্বাস না করে ?

—অভিমান করে বলবে, স্যার, আমার কথায় অবিশ্বাস ? আর এ পোড়ামুখ দেখাব না—গঙ্গায় ডুবে মরব। বলতে বলতে কাঁদতে থাকবে। বিজয়কুমার বলবে—কী মুশ্কিল—কী মুশ্কিল ! তখন তার পা জড়িয়ে ধরবার কায়দা করে তাকে পটকে দেবে। আর ধাঁই করে যদি এবার আছাড় খায়, আর ভাবতে হবে না—তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে—বুঝেছ ?

টেনিদা বললে, বুঝেছি।

—তা হলে এগোও।

—এগোচ্ছি।

—খবর্দার, কোনো রকম চালাকি করতে যেয়ো না, তা হলেই—

—আজ্ঞে জানি, মারা পড়ব।

ঘেঁটুদা খুশি হয়ে বললে, সাবাস—ঠিক আছে। এবার এগিয়ে যাও—

টেনিদা বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, এগিয়ে চললুম।

আমরা দু'জনে গুটিগুটি 'জয় মা তারা' স্টুডিয়োর দিকে চলতে লাগলুম। ওরা যে কোথায় কোন্খানে ভুট করে লুকিয়ে গেল, আমরা পেছন ফিরেও আর দেখতে পেলুম না।

আমি চাপা গলায় বললুম, টেনিদা ?

—হুঁ !

—এই তো সুযোগ।

টেনিদা আবার বললে, হুঁ।

—সামনে হুঁ-হুঁ করছ কী ? এখন ওরা কেউ কোথাও নেই—আমরা মুক্ত—এখন একেবারে বেপরোয়া হয়ে—মানে যাকে বলে উদ্দাম উল্লাসে ছুটে পালাতে পারি এখান থেকে। ফিল্মি স্টুডিয়ো যখন রয়েছে, তখন জায়গাটা নিশ্চয় টালিগঞ্জ। আমরা যদি 'জয় মা তারা' স্টুডিয়োতে না গিয়ে পাশের খানা-খন্দল ভেঙে এখন চোঁ-চোঁ ছুটতে থাকি, তা হলে—

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, এখন কুরুবকের মতো বকবক করিসনি প্যালা, আমি ভাবছি।

—কী ভাবছ? সত্যি সত্যিই তুমি স্টুডিয়োতে ঢুকে ফিল্মস্টার বিজয়কুমারের পকেট মারবে নাকি?

—শাট্ আপ! এখন সামনে পুঁদিচ্চেরি!

খুব জটিল সমস্যায় পড়লে টেনিদা বরাবর ফরাসী আউড়ে থাকে। আমি বললুম, পুঁদিচ্চেরি? সে তো পণ্ডিচেরী! এখানে তুমি পণ্ডিচেরী পেলে কোথায়?

—আঃ, পণ্ডিচেরী নয়, আমি বলছিলুম, ব্যাপার অত্যন্ত ঘোরালো। বুদ্ধি করতে হবে।

আমি বললুম, কখন বুদ্ধি করবে? ইদিকে আমাকে আবার এক বিদিকিচ্ছিরি পাগল সাজিয়েছে, মুখে কিচকিচ করছে সাতরাজ্যের দাড়ি, কুট্‌কুটুনিতে আমি তো মারা গেলুম! ওদিকে তুমি আবার চলেছ পকেট মারতে—ধরা পড়লে কিলিয়ে একেবারে কাঁটাল পাকিয়ে দেবে, এখন—

—চোপরাও!

অগত্যা চুপ করতে হল। আর আমরা একেবারে জয় মা তারা স্টুডিয়োর গেটের সামনে এসে পৌঁছুলুম। ভয়ে আমার বুক দুরদুর করতে লাগল—মনে হতে লাগল, একটু পরেই একটা যাচ্ছেতাই কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে।

স্টুডিয়োর লোহার ফটক আধখোলা। পাশে দারোয়ানের ঘর আর ঘরের বাইরে খালি গায়ে এক হিন্দুস্থানী জাঁদরেল দারোয়ান বসে একমনে তার আরো জাঁদরেল গোঁফজোড়াকে পাকিয়ে চলেছে।

টেনিদাকে দেখেই সে একগাল হেসে ফেলল!

—কেয়া ভেইয়া কম্বলরাম, সব আচ্ছা হ্যায়?

—হাঁ, সব আচ্ছা হ্যায়।

—তুম্‌হারা সাথ্‌ ই পাগলা কৌন্ হো?

আমাকেই পাগল বলছে নিশ্চয়। যে-লোকটা আমাকে হাতের কাছে পেয়ে মনের সুখে মেক-আপ দিয়েছিল, তাকে আমার স্রেফ্‌ কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে করল। প্রায় বলতে যাচ্ছিলুম, হাম্ পাগলা নেহি হ্যায়, পটলডাঙাকা প্যালারাম হ্যায়, কিন্তু টেনিদার একটা চিমটি খেয়েই আমি থেমে গেলুম।

টেনিদা বললে, ই পাগলা নাহি হ্যায়—ই হ্যায় আমার ছোট ভাই কাঁথারাম।

—কাঁথারাম ?—দারোয়ান হাঁ করে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বললে, রাম—রাম—সিয়ারাম! রামজীনে ছুনিয়ামে কেত্‌না অজীব চীজোঁকো পয়দা কিয়া! আচ্ছা—চলা যাও অন্দরমে। তুম্‌হারা বাবু দু-নম্বর মে হ্যায়—ছঁয়াই শুটিং চল্‌ রহা হ্যায়!

আমরা স্টুডিয়োর ভেতরে পা দিলুম। চারদিক গাছপালা, ফুলের বাগান, একটা পরীমার্কা ফোয়ারাও দেখতে পেলুম—আর কত যে আলো জলছে, কী বলব। দেখলুম সব সারি সারি গুদামের মতো উঁচু উঁচু টিনের ঘর, তাদের গায়ে বড়ো সাদা হরফে এক দুই করে নম্বর লেখা। দেখলুম, বড়ো বড়ো মোটরভ্যানে রেডিয়োর মতো কী সব যন্ত্র নিয়ে, কানে হেডফোন লাগিয়ে কারা সব বসে আছে, আর রেডিয়োর মতো সেই যন্ত্রগুলোতে থিয়েটারের পার্ট করার মতো আওয়াজ উঠছে।

প্যান্ট্‌পরা লোকজন ব্যস্ত হয়ে এপাশ ওপাশ আসা-যাওয়া করছিল, আর মাঝে মাঝে কেউ কেউ তাকিয়ে দেখছিল আমার দিকেও। একজন ফস করে এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল।

—বাঃ, বেশ মেকআপ হয়েছে তো। চমৎকার!

মেক আপ!

ধরে ফেলেছে!

আমার বুকের রক্ত সঙ্গে সঙ্গে জল হয়ে গেল। আমি প্রায় হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু টেনিদা পটাং করে আমাকে চিমটি কাটল।

লোকটা আবার বললে, একৃস্ট্রা বুঝি ?

একৃস্ট্রা তো বটেই, কম্বলরামের সঙ্গে কাঁথারাম ফাউ। আমি 'কাঁ' বলবার জন্যে হাঁ করেছিলুম, কিন্তু তক্ষুণি টালিগঞ্জের গোটাকয়েক ধাড়ী সাইজের মশা আমার মুখ বরাবর তাড়া করে আসাতে ফস করে মুখটা বন্ধ করে ফেললুম।

টেনিদা বললে, হ্যাঁ স্যার, একৃস্ট্রা। থিয়োরেম নয়, প্রব্‌লেম নয়, একদম একৃস্ট্রা! আর এত বাজে একৃস্ট্রা যে বলাই যায় না!

—বা-রে কম্বলরাম, বিজয়কুমারের সঙ্গে থেকে তো খুব কথা শিখেছ দেখছি। তা এ কোন্‌ বইয়ের একৃস্ট্রা ?

—আজ্ঞে জিয়োমেট্রির। থার্ড পার্টের।

লোকটা এবারে চটে গেল। বললে, দেখো কম্বলরাম, বিজয়কুমার আদর দিয়ে দিয়ে তোমার মাথাটি খেয়েছেন। তুমি আজকাল যাকে তাকে যা খুশি তাই বলো। তুমি যদি আমার চাকর হতে, তাহলে আমি তোমায় পিটিয়ে স্রেফ্ তক্তপোষ করে দিতুম।

বলেই—হন হন করে চলে গেল সে।

আমি ভয় পেয়ে বললুম, টেনিদা—কী হচ্ছে এসব ?

টেনিদা বললে, এই তো সবে রগড় জমতে শুরু হয়েছে। চল—এবার ঢোকা যাক দু-নম্বর স্টুডিয়োতে।

ছয়

স্টুডিয়ো মানে যে এমনি একখানা এলাহী কাণ্ড, কে ভেবেছিল সে কথা।

সামনেই যেন থিয়েটারের ছোট একটা স্টেজ খাটানো রয়েছে, এমনি মনে হল। সেখানে ঘর রয়েছে, দাওয়া রয়েছে, পেছনে আবার সিনে আঁকা নারকেল গাছও উঁকি মারছে। সে সব তো ভালোই—কিন্তু চারিদিকে সে কী ব্যাপার। কত সব বড়ো বড়ো মোটা মোটা ইলেক্‌ট্রিকের তার, বনবনিয়ে ঘোরা সব মস্ত মস্ত পাখা। ক-জন লোক সেই দাওয়াটার ওপর আলো ফেলছে, একজন কোটপ্যান্ট পরা মোটামতন লোক বলছে : ঠিক আছে—ঠিক আছে।

ঢুকে আমরা দুজন স্রেফ্ হাঁ করে চেয়ে রইলুম। সিনেমা মানে যে এই রকম গোলমেলে ব্যাপার তা কে জানত ? কিছুক্ষণ আমরা কোনো কথা বলতে পারলুম না, এককোণায় দাঁড়িয়ে ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে থাকলুম কেবল।

কোত্থেকে আর একজন গেঞ্জি আর প্যান্টপরা লোক বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠল : মনিটার।

সঙ্গে সঙ্গে মোটা লোকটা বললে, লাইট্‌স।

তার আশ পাশ থেকে, ওপর থেকে—অসংখ্য সার্চলাইটের মতো আলো সেই তৈরী করা ঘরটার দাওয়ায় এসে পড়ল। মোটা লোকটা বললে, পাঁচ নম্বর কাটো।

—কার নম্বর আবার কেটে নেবে? এখানে আবার পরীক্ষা হয় নাকি? টেনিদাকে আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলুম।

টেনিদা কুট্ করে আমার কানে একটা চিমটি দিয়ে ফ্যাস ফ্যাস করে বললে, চুপ করে থাক।

মোটা লোকটা আবার চেঁচিয়ে বললে, কেটেছ পাঁচ নম্বর?

একটা উঁচুমতন জায়গা থেকে কে যেন একটা আলোর ওপর একটুকরো পিসবোর্ড ধরে বললে, কেটেছি।

গেঞ্জী আর প্যাণ্টপরা লোকটা আবার বাজখাঁই গলায় বললে, ডায়লগ।

আমাদের পাশ থেকে হাওয়াই শার্ট আর পা-জামা পরা বেঁটে মতন একজন লোক মোটা একটা খাতা বগলদাবা করে এগিয়ে গেল। আর তখুনি আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে দেখলুম—কোত্থেকে সুট করে আলোর মধ্যে এসে দাঁড়ালেন—আর কেউ নয়, স্বয়ং বিজয়কুমার। তাঁর পরণে হল্‌দে জামা—হল্‌দে কাপড়—যেন ছট পরব সেরে চলে এসেছেন।

সেই বিজয়কুমার! যিনি ঝপাং করে নদীর পুল থেকে জলে লাফিয়ে পড়েন—চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে উধাও হয়ে যান, যিনি কখনো বা ভ্যারেণ্ডার ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আকুল হয়ে গান গাইতে থাকেন, কথা নেই বার্তা নেই—দুম্ করে হঠাৎ মারা যান—সেই দুরন্ত—দুর্ধর্ষ—দুবার বিজয়কুমার আমাদের সামনে। একেবারে সশরীরে দাঁড়িয়ে। আর ওঁরই পকেট থেকে আমাদের নস্যির কৌটোটা লোপাট করে দিতে হবে।

আমি বলতে যাচ্ছিলুম 'টে'—সঙ্গে সঙ্গে টেনিদা আমার কানে আবার দারুণ একটা চিমটি কষিয়ে ফ্যাস ফ্যাস করে বললে, চুপ।

আমার বুকের ভেতর দুর দুর করে কাঁপছে। এখুনি—এই মুহূর্তে ভয়াবহ লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটে যাবে একটা। এত আলো, এত লোকজন—এর ভেতর থেকে নস্যির কৌটো লোপাট করা। ধরা তো পড়তেই হবে, আর স্টুডিয়োশুদ্ধু লোক সেই ফাঁকে আমাদের পিটিয়ে তুলোধোনা করে দেবে। লেপ-টেপ করে ফেলাও অসম্ভব নয়।

আমি দেখলুম, বিজয়কুমার সেই পা-জামা পরা বেঁটে লোকটার খাতা থেকে কী যেন বিড়বিড় করে পড়ে নিলেন খানিকক্ষণ তারপর বললেন, ইয়েস—ঠিক আছে।

বলেই, এগিয়ে এসে ঘরের দাওয়াটায় বসলেন। অমনি যেন শূন্য দিয়ে

একটা মাইক্রোফোন নেমে এসে ওঁর মাথার একটুখানি ওপরে থেমে দাঁড়ালো। বিজয়কুমার ভাবে গদগদ হয়ে বলতে লাগলেন: 'না—না, এ আমার মাটির ঘর, আমার স্মৃতি, আমার স্বপ্ন—এ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। জমিদারের অত্যাচারে যদি আমার প্রাণও যায়—তবু আমার ভিটে থেকে কেউ আমায় তাড়াতে পারবে না।'

আমি টেনিদার কানে কানে জিজ্ঞেস করলুম, রবিঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' ছবি হচ্ছে না?

টেনিদা বললে, তা হবে।

—তাহলে বিজয়কুমার নিশ্চয় উপেন। কিন্তু আমগাছ কোথায় টেনিদা? পেছনে তো দেখছি দুটো গাছ। উপেনের যে নারকেল গাছও ছিল, কই—রবিঠাকুরের কবিতায় তো সে কথা লেখা নেই।

টেনিদা আবার আমাকে ফ্যাস ফ্যাস করে বললে, বেশি বকিস্‌নি, প্যালা। ব্যাপার এখন খুব সিরিয়াস—যাকে বলে পুঁদিচ্চেরি। এখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক—ছাখ্‌ আমি কী করি। ওই বিদিকিচ্ছি সিন্ধুঘোটকটাকে যদি ঠাণ্ডা না করতে পারি, তাহলে আমি পটলডাঙার টেনি শর্মাই নই!

এর মধ্যে দেখি, বিজয়কুমার বক্তাটি শেষ করে একখানা রুমাল নিয়ে চোখ মুছছেন। গেঞ্জী আর প্যান্টপরা মোটা লোকটা আকাশে মুখ তুলে চাঁছা গলায় চেঁচিয়ে উঠেছে: সাউণ্ড, হাউইজ্‌ জ্যাট? (হাউজ ছাট?) আর যেন আকাশবাণীর মতো কার মিহিসুর ভেসে আসছে: ও-কে, ও-কে—

বিজয়কুমার দাওয়া ছেড়ে উঠে পড়তেই—

টেনিদা আমার কানে কানে বললে, প্যালা, স্টেডি—আর বলেই ছুটে গেল বিজয়কুমারের দিকে।

—স্যার—স্যার—

বিজয়কুমার ভীষণ চমকে বললে, আরে, কম্বলরাম যে। আরে, তুই না এক মাসের জন্যে দেশে গিয়েছিলি? কী ব্যাপার, হঠাৎ ফিরে এলি যে? আর স্টুডিয়োতেই বা এলি কেন হঠাৎ? কী দরকার?

আমি দম বন্ধ করে দেখতে লাগলুম।

—স্যার, আমি কম্বলরাম নই—টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল।

—তবে কি ভোম্বলরাম?—বিজয়কুমার খুব খানিকটা খ্যাঁক খ্যাঁক করে

হেসে উঠলেন: কোথা থেকে সিদ্ধি-ফিদ্ধি খেয়ে আসিস নি তো? যা—যা—শিগগীর বাড়ি যা, আর আমার জন্যে ভালো একটা মুরগীর রোস্ট পাকিয়ে রাখগে। বারোটা নাগাদ আমি ফিরব।

—আমার কথা শুনুন স্যার, আপনার ঘোর বিপদ।

বিজয়কুমার দারুণ অবাক হয়ে কিছুক্ষণ হাঁ করে টেনিদার দিকে চেয়ে রইলেন: ঘোর বিপদ? কী বকছিস কম্বলরাম?

—আবার বলছি আপনাকে, আমি কম্বলরাম নই। আমি হচ্ছি পটলডাঙার টেনিরাম, ভালো নাম ভজহরি মুখুজ্জে!

আর বলেই টেনিদা একটানে গাল থেকে জড়ুলটা খুলে ফেলল: দেখছেন?

—কী সর্বনাশ। বিজয়কুমার হঠাৎ হাঁউমাঁউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন।

স্টুডিয়োতে হৈ চৈ পড়ে গেল।

—কী হল স্যার? কী হয়েছে?

বিজয়কুমার বললেন, কম্বলরাম ওর গাল থেকে জড়ুল তুলে ফেলেছে!

সেই গেঞ্জী আর প্যান্টপরা মোটা ভদ্রলোক সোজা ছুটে এলেন টেনিদার দিকে।

—হোয়াট? জড়ুল খুলে ফেলেছে! জড়ুল কি কখনো খোলা যায়? আরো বিশেষ করে কম্বলরামের জড়ুল? ইম্‌পসিবল্ ইম্‌পসিবল্!

টেনিদা আবার মোটা গলায় বললে, এই থার্ড টাইম বলছি, আমি কম্বলরাম নই—লেপরাম, জাজিমরাম, মশারিরাম, তোষকরাম—এমনি—রামেরাম—কোন রামই নই। আমি হচ্ছি পটলডাঙার ভজহরি মুখুজ্জে! দুনিয়াসুদ্ধু লোক আমাকে এতটা কাল টেনি শর্মা বলে জানে!

স্টুডিয়োর ভেতরে একসঙ্গে আওয়াজ উঠল: মাই গড্!

বিজয়কুমার কেমন ভাঙা গলায় বললে, তা হলে কম্বলরামের ছদ্মবেশ ধরার মানে কী? নিশ্চই একটা বদ্‌মতলব আছে! খুব সম্ভব আমাকে লোপাট করবার চেষ্টা। তারপর হয়তো কোথাও লুকিয়ে রেখে একেবারে বা একলাখ টাকার মুক্তিপণ চেয়েই চিঠি দেবে আমার বাড়িতে!

সিনেমার অমন দুর্ধর্ষ বেপরোয়া নায়ক বিজয়কুমার হঠাৎ যেন কেমন চামচিকের মতো শুঁটকো হয়ে গেলেন আর চি চিঁ করে বলতে লাগলেন: ওঃ গেলুম,। খুন—পুলিস—ডাকাত—!

আর একজন কে চেঁচিয়ে উঠল : অ্যাম্বুলেন্স—ফায়ার বিগ্রেড্—সৎকার সমিতি!

কে যেন আরো জোরে চ্যাচাতে লাগল : মড়ার খাটিয়া, হরিসংকীর্তনের দল—

টেনিদা হঠাৎ বাঘাটে গলায় হুঙ্কার ছাড়ল : সাইলেন্স!

আর সেই নিদারুণ হুঙ্কারে স্টুডিয়ো শুদ্ধু লোক কেমন ঘেবড়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

টেনিদা বলতে লাগল : সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ! (বেশ বক্তৃতার ভঙ্গিতে হাত-পা নেড়ে বলে চলল) আপনারা মিথ্যে বিচলিত হবেন না। আমি ডাকাত নই, অত্যন্ত নিরীহ ভদ্রসন্তান। পুলিস যদি ডাকতেই হয়, তা হলে ডেকে সিন্ধুঘোটককে গ্রেপ্তার করবার জন্যে ব্যবস্থা করুন। সেই আমাদের পাঠিয়েছে বিজয়কুমারের পকেট থেকে নস্যির কৌটো—

আর বলতে হল না।

'সিন্ধুঘোটক' বলতেই সেই মোটা ভদ্রলোক—'উঃ গেলুম'—বলে একটা সোফার ওপর চিৎপাত হয়ে পড়লেন। আর 'নস্যির কৌটো' শুনেই বিজয়কুমার গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ করলেন : প্যাক আপ—প্যাক আপ।

মোটা ভদ্রলোক তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন সোফা থেকে। তেড়ে গেলেন বিজয়কুমারের দিকে।

—যখনই শুনেছি সিন্ধুঘোটক তখনই জানি একটা কেলেঙ্কারী আজ হবে। কিন্তু প্যাক আপ চলবে না—আজ শুটিং হবে না। ওই অযাত্রা নাম শোনাবার পরে আমি কিছুতেই কাজ করব না আজ। আমার কণ্ট্রাক্ট খারিজ করে দিন।

—খারিজ মানে?—প্যান্টপরা মোটা ভদ্রলোক দাপাদাপি করতে লাগলেন : খারিজ করলেই হল? পয়সা লাগে না—না? যেই শুনেছি সিন্ধুঘোটক—আমারও মাথায় খুন চেপে গেছে। এক-দুই-তিন—আই মীন দশ পর্যন্ত গুণতে রাজি আছি—এর মধ্যে আপনি যদি ক্যামেরার সামনে গিয়ে না দাঁড়ান, সত্যিই একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে।

বিজয়কুমার রেগে আগুন হয়ে গেলেন। মাটিতে পা ঠুকে বললেন, কী, আমাকে ভয় দেখানো। খুনোখুনি হয়ে যাবে!—আস্তিন গোটাতে গোটাতে বললেন, চলে আয় ইদিকে, এক ঘুষিতে তোর দাঁত উপড়ে দেব।

—বটে। দাঁত উপড়ে দেবে! আমাকে তুই-তোকারি!—বলেই মোটা লোকটা বিজয়কুমারের দিকে ঝাঁপ মারল : ইঃ, ফিল্মস্টার হয়েছেন! তারকা! যদি এক চড়ে তোকে জোনাকি বানিয়ে দিতে না পারি—

আমি হাঁ করে ব্যাপারটা দেখছিলুম আর আমার মাথার ভেতরে সব যেন কী রকম তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মোটা লোকটা ঝাঁপিয়ে এগিয়ে আসতেই কেলেঙ্কারীর চরম। ঘরভর্তি ইলেকট্রিকের সরুমোটা তার ছড়িয়ে ছিল, লোকটার পায়ে একটা তার জড়িয়ে গেল, দুড়ুম করে আছাড় খেলো সে। একটা আলো আছড়ে পড়ল তার সঙ্গে। তক্ষুনি দুম্—ফটাস্।

কোথা থেকে যেন কী কাণ্ড হয়ে গেল—স্টুডিয়ো জুড়ে একেবারে অথৈ অন্ধকার।

তার মধ্যে আকাশ-ফাটানো চিৎকার উঠতে লাগল : চোর—ডাকাত—খুন—অ্যাম্বুলেন্স—সৎকার-সমিতি—হরি-সংকীর্তন—মড়ার খাটিয়া—

আর সেই অন্ধকারে কে যেন কাকে জাপটে ধরল, দুম্‌দাম্ করে কিলোতে লাগল। অনেক গলার আওয়াজ উঠতে লাগল : মার্—মার্—মার্—

টেনিদা টকাৎ করে আমার কানে একটা চিম্‌টি দিয়ে বললে, প্যালা—এবার—কুইক্—

কিসের কুইক্ তা আর বলতে হল না। সেই অন্ধকারের মধ্যে টেনে দৌড় লাগালুম দু'জনে।

'জয় মা তারা' স্টুডিয়োর বাইরের বাগানেও সব আলো নিবে গেছে, গেটে যে দরোয়ান বসেছিল, সে কখন গোলমাল শুনে ভেতরে ছুটে এসেছে। আমরা খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম, তারপর ঢোকবার সময় ডানদিকে যে পালানোর রাস্তা দেখেছিলুম, তাই দিয়ে আরো অনেকখানি দৌড়ে দেখি—সামনে একটা বড়ো রাস্তা।

কিন্তু সিন্ধুঘোটক?

তার দলবল?

না—কেউ কোথাও নেই। শুধু একটু দূরে মীটার তুলে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, তাতে বসে মস্ত গালপাট্টা দাড়িওলা এক শিখ ড্রাইভার একমনে ঝিমুচ্ছে।

টেনিদা বললে, ভগবান আছেন প্যালা, আর আমাদের পায় কে! সর্দারজী—এ সর্দারজী—

সর্দারজী চোখ মেলে উঠে বসে ঘুম-ভাঙা জড়ানো-গলায় বললে, কেয়া হুয়া?

—আপ ভাড়া যায়েগা?

—কাঁহে নেহি জায়েগা? মীটার তো খাড়া হ্যায়!

—তব চলিয়ে—বহুৎ জল্‌দি।

—কাঁহা?

—পটলডাঙা!

—ঠিক হ্যায়। বৈঠিয়ে।

গাড়ি ছুটল। একটু পরেই দেখলুম আমরা রসা রোডে এসে পড়েছি। তখনো পথে সমানে লোক চলেছে, ট্রাম যাচ্ছে—বাস ছুটছে।

আমি তখনো হাঁপাচ্ছি।

বললুম, টেনিদা, তা হলে সত্যিই সিন্ধুঘোটকের হাত থেকে বেঁচে গেলুম আমরা!

টেনিদা বললে, তাই তো মনে হচ্ছে!

—কিন্তু ব্যাপার কী, টেনিদা? হঠাৎ গেঞ্জি-পরা ঐ মোটা লোকটা অত চটে গেল কেন, আর নস্যির কৌটোর কথা শুনেই বা বিজয়কুমার—

টেনিদা কটাং করে আমায় একটা চিমটি কেটে বললে, চুলোয় যাক। পড়ে মরুক তোর সিন্ধুঘোটক, আর যমের বাড়ি যাক তোর ঐ বিজয়কুমার। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারলে বাঁচি আমরা দু'জনে।

আমাদের নিয়ে গাড়ি যখন পটলডাঙার মোড়ে এসে থামলো—তখন মহাবীরের পানের দোকানের ঘড়িতে দেখি—ঠিক দশটা বাজতে আট মিনিট!

মাত্র তিন ঘণ্টা!

তিন ঘণ্টার মধ্যে এত কাণ্ড—একেবারে রহস্যের খাসমহল! কিন্তু তখনও কিছু বাকী ছিল!

টেনিদা বললে, সর্দারজী কেত্‌না হুয়া?

পরিষ্কার বাংলায় সর্দারজী বললে, পয়সা লাগে না···বাড়ি চলে যাও!

হঠাৎ সর্দারজী হা-হা করে হেসে উঠল। একটানে দাড়িটা খুলে ফেলে বললে, চিনতে পারছ?

আমরা লাফিয়ে পেছনে সরে গেলুম। টেনিদার মুখ থেকে বেরুল: ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস!

সর্দারজী আর কেউ নয়—স্বয়ং সেই অবলাকান্ত। সেই মেফিস্টোফিলিসদের একজন!

আর একবার অট্টহাসি, তারপরেই তীরবেগে ট্যাক্সিটা শিয়ালদার দিকে ছুটে চলল।

আমি বুদ্ধি করে নম্বরটা পড়তে চেষ্টা করলুম, কিন্তু পড়া গেল না—একরাশ নীল ধোঁয়া বেরিয়ে গাড়ির পেছনের নম্বর টম্বর সব ঢেকে দিয়েছে।

সাত

সিনেমা দেখতে গিয়েছিলুম—বেশ ভালো একটা উপদেশপূর্ণ ইংরেজী বই, এইসব বলে-টলে তো কোনোমতে বাড়ির বকুনির হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। কিন্তু মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে রইল। বলতে ভুলে গেছি,

গাড়িতে বসেই মুখের রং-টংগুলো ঘষে-টসে তুলে ফেলেছিলুম—আর বাড়িতে ঢুকেই সোজা বাথরুমে একদম সাফসুফ হয়ে নিয়েছিলুম। ভাগ্যিস অত রাতে কারো ভালো করে নজরে পড়েনি, নইলে শেষ পর্যন্ত হয়তো একটা কেলেঙ্কারীই হয়ে যেত।

কি ব্যাপারটা কী হল? কেন আমাদের অমন করে ধরে ধরে নিয়ে গেল সিন্ধুঘোটক, কেনই বা মুখে রং মেখে সং সাজাল, আর জয় মা তারা স্টুডিয়োর ভেতরেই বা এ-সব কাণ্ড কেন ঘটে গেল—সে-সবের কোনো মানেই বোঝা যাচ্ছে না! আরো বোঝা যাচ্ছে না, দাড়ি লাগিয়ে অবলাকান্ত কেনই আমাদের বিনে পয়সায় পৌঁছে দিলে, আমরা বিজয়কুমারের নস্যির কৌটো লোপাট না করেই পালিয়ে এসেছি জেনেও হাতে পেয়ে সে আমাদের ধরে নিয়ে গুম করল না কেন!

ভীষণ গোলমেলে সব ব্যাপার! মানে, সেই সব অঙ্কের চাইতেই গোলমেলে—যেখানে দশমিকের মাথার ওপর আবার একটা ভেঙ্কুলাম থাকে, কিংবা তেল মাখা উঁচু বাঁশের ওপর থেকে এক কাঁদি কলা নামাতে গিয়ে একটা বাঁদর ছ' ইঞ্চি ওঠে তো সোয়া পাঁচ ইঞ্চি পিছলে নেমে আসে!

সকালে বসে বসে এই সব যতই ভাবছি, ততই আমার চাঁদির ওপরটা সুর সুর করছে, গলার ভেতরটা কুটকুট করছে, কানের মাঝখানে কট্‌কট্‌ আর নাকের দু'পাশে সুড়সুড় করছে। ভেবে-চিন্তে থই না পেয়ে শেষে মনের দুঃখে টেবিল বাজিয়ে বাজিয়ে আমি সত্যেন দত্তের লেখা বিখ্যাত সেই ভুবনের গানটা গাইতে শুরু করে দিলুম:

"ভুবন নামেতে ব্যাদড়া বালক
তার ছিল এক মাসী,
আহা—ভুবনের দোষ দেখে দেখিত না
সে মাসী সর্বনাশী!
শেষে—কলাচুরি মূলোচুরি করে বাড়ে
ভুবনের আশ্‌ করা,
চোর হতে পাকা ডাকাত হল সে
ব্যবসা মানুষ মারা—"

এই পর্যন্ত বেশ করুণ গলায় গেয়েছি, এমন সময় হঠাৎ তেতলা থেকে এ্যায়সা মোটা ডাক্তারী বই হাতে নিয়ে মেজদা তেড়ে নেমে এল।

—এই প্যালা, কী হচ্ছে এই সকাল বেলায়?

বললুম, গান গাইছি।

—এর নাম গান? এতো দেখছি একসঙ্গে স্টেন গান, ব্রেন-গান অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট গান—মানে স্বর্গে মা সরস্বতীর গায়ে পর্যন্ত গিয়ে গোলা লাগবে!

আমি বললুম, তুমি তো ডাক্তার—গানের কী জানো? এর শেষটা যদি শোনো—তা আরো করুণ। বলে আবার টেবিল বাজিয়ে যেই শুরু করেছি—

"ধরা পড়ে গেল, বিচার হইল
ভুবনের হবে ফাঁসি,
হাউ হাউ করে লাড়ু-মুড়ি বেঁধে
ছুটে এল তার মাসী—"

অমনি বেরসিক মেজদা ধাঁই করে ডাক্তারী বইয়ের এক ঘা আমার পিঠে বসিয়ে দিলে। বিচ্ছিরি রকম দাঁত খিঁচিয়ে বললে, আরে যা খেলে কচুপোড়া। মাথা ধরিয়ে দিলি তো! লেখা নেই, পড়া নেই, বসে ষাঁড়ের মতো চ্যাচাচ্ছে!

—বা-রে, এই তো সবে আমাদের স্কুলে সামার ভ্যাকেশন শুরু হল, এখুনি পড়ব?

—তবে বেরো, রাস্তায় গিয়ে চ্যাচা।

আমি গাঁ গাঁ করে বেরিয়ে এলুম রাস্তায়! এ-সব বেরসিকদের কাছে সঙ্গীত-চর্চা না করে আমি বরং চাটুজ্জেদের রকে বসে পটলডাঙার নেড়ী কুকুরগুলোকেই গান শোনাব।

কিন্তু গান আর গাইতে হল না। তার আগেই দেখি টেনিদা হন হন করে আসছে।

আসছে আমার দিকেই।

আমায় দেখেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললে, প্যালা, কুইক্, কুইক্। তোর কাছেই যাচ্ছিলুম—চট্‌পট্ চলে আয়।

—আবার কী হল?

টেনিদা বললে, সিন্ধুঘোটক।

—অ্যা। কপাৎ করে আমি একটা খাবি খেলুম: সিন্ধুঘোটক? কোথায়?

—আমাদের বাড়িতে! বৈঠকখানায় বসে আছে।

—অ্যা!

—তখুনি ছ'চোখ কপালে তুলে আমি প্রায় রাস্তার মধ্যেই ধপাস্ করে বসে পড়তে যাচ্ছিলুম, টেনিদা খপ্ করে আমাকে ধরে ফেলল। বললে, দাঁড়া না, এখুনি ঘাবড়াচ্ছিস্ কেন? চলে আয় আমার সঙ্গে—

চলেই এলুম।

বুকের ভেতরটা হাঁকপাঁক করছিল। কিন্তু এই বেলা সাড়ে ন-টার সময়—টেনিদাদের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে, সিন্ধুঘোটক আমাদের আর কী করবে?

কিংবা, এ-সব মারাত্মক লোককে কিছুই বিশ্বাস নেই, রামহরি বটব্যাল কিংবা যদুনন্দন আঢ্যের গোয়েন্দা উপন্যাসে দিনে দুপুরেই যে কত সব দুর্ধর্ষ ব্যাপার ঘটে যায় সে-ও তো আমার অজানা নেই।

আমি আর একবার ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলুম, টেনিদা—সঙ্গে দস্যুদল—মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র—

—কিছু না—কিছু না, একেবারে একা!

—পুলিশে খবর দিয়েছ?

—কিছু দরকার নেই। তুই আয় না—

'জয় মা তারা'—বলতে গিয়ে সেই অলক্ষণে স্টুডিয়োটাকে মনে পড়ল, সামলে নিয়ে বললুম, জয় মা কালী—আর ঢুকে পড়লুম টেনিদাদের বাড়িতে। আর ঢুকেই দেখি চেয়ারে বসে সিন্ধুঘোটক।

সেই চেহারাই নেই। গায়ে মুগার পাঞ্জাবী, হাতে গোটাকয়েক আংটি, একমুখ হাসি। বললে, এসো প্যালারাম এসো—তোমার জন্যেই বসে আছি!

আমি হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলুম। তারপর ভয়টা কেটে গেলে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি—আপনি কে?

—আমার নাম হরিকিঙ্কর ভড় চৌধুরী। 'মনোরমা ফিল্ম কোম্পানি'-র নাম শুনেছ তো? আমিই সেই ফিল্ম কোম্পানির মালিক।

—কিন্তু কাল রাতে—আমাদের নিয়ে আপনি এ সব কী কাণ্ড করলেন?

—খুলে বললেই সবটা বুঝতে পারবে। এসো, বোসো বলছি।

আট

তারপর যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই :

তিনি একটা ছবি আরম্ভ করলেন, বিজয়কুমারকে তার নায়ক করতে চান। কিন্তু বিজয়কুমার বলে বসেছেন গজানন মাইতির 'পথে পথে বিপদ—' ছবির কাজ শেষ না হলে তিনি কোনো ছবিতে নামবেন না! এখন গজানন মাইতির সঙ্গে হরিকিঙ্কর ভড় চৌধুরীর ঘোর শত্রুতা। হরিকিঙ্কর তাই পণ করলেন গজাননের ছবির শুটিং পণ্ড করে দেবেন।

কাল রাতেই ছিল গজাননের ছবির প্রথম শুটিং।

গজানন ঘুঘু লোক—সে হুকুম দিয়েছিল, তার শুটিংকে কোনো বাইরের লোক ঢুকতে পারবে না। সুতরাং এমন কাউকে দরকার—যে চট্ করে স্টুডিয়োতে ঢুকে যেতে পারে। আর সে পারে কম্বলরাম।

কিন্তু কম্বলরাম তো দেশে চলে গেছে। তাই তিনি চারদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন—ঠিক কম্বলরামের মতো একটা লোক কোথায় পাওয়া যায়।

তারপর গড়ের মাঠে আমাদের দেখে—

—কিন্তু বিজয়কুমারের নস্যির কৌটোর মানে কী? আর সিন্ধুঘোটক সাজবারই বা আপনার কী দরকার ছিল?

হরিকিঙ্কর মিটি মিটি হাসলেন।

—বিজয়কুমার ছেলেবেলায় খুব নস্যি নিতেন। একদিন স্কুলের ক্লাসে বসে নস্যি নিচ্ছেন, হেড মাস্টারমশাই দেখতে পেয়ে কান ধরে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা করে বেত পিটিয়ে দিলেন। সেই থেকে নস্যির নাম শুনলেই বিজয়কুমার ক্ষেপে যান। এখন ফিল্মে ঢুকেও বিজয়কুমারের প্রতিজ্ঞা—তার ছবি তোলার সময় কেউ নস্যি টানলে, কিংবা নস্যির নাম উচ্চারণ করলে তিনি তক্ষুণি স্টুডিও থেকে চলে যাবেন।

আর সিন্ধুঘোটক?

—লোকে আড়ালে গজাননকে সিন্ধুঘোটক বলে। গজানন তা জানেন, তাঁর ধারণা কথাটা অপয়া, শুটিংয়ের সময় ওটা কানে গেলে একটা কিছু কেলেঙ্কারী হবেই।

টেনিদা বললে, এর জন্যে এত কাণ্ড করলেন আমাদের নিয়ে? যদি গজাননবাবু আমাদের ঠেঙিয়ে দিতেন তাহলে?

—তা হলে আমি তোমাদের হাসপাতালে পাঠাতুম। সে সব ব্যবস্থা ছিলই।—

হরিকিঙ্কর আবার ফিক ফিক করে হাসতে লাগলেন: যাক—সব কিছুই ভালোয় ভালোয় হয়ে গেছে, আজ সকালে নিজে থেকে এসেই বিজয়কুমার আমার সঙ্গে ছবির কন্ট্রাক্ট সই করে গেছেন।

—কিন্তু আপনি আমাদের ঠিকানা জানলেন কী করে?

—কাল অবলাকান্ত তোমাদের রাস্তার মোড়ে পৌঁছে দিয়ে গেল না? আর পটলডাঙার টেনি শর্মা তো বিখ্যাত লোক, তাকে খুঁজে বের করতেই কতক্ষণই বা লাগে?

আমরা চুপ!

হরিকিঙ্কর বললেন, এইবার কাজের কথা। তোমাদের কিছু পুরস্কার দেব বলেছিলুম। অনেক কষ্ট করেছ, রং চং মাখিয়ে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছি—আমার একটা কৃতজ্ঞতা তো আছে। এই প্যাকেট তোমাদের দুজনকে দিয়ে গেলুম, আমি যাওয়ার পরে খুলে দেখো।

কাগজে মোড়া দুটো ভারী বাক্স তিনি তুলে দিলেন আমাদের দু'জনের হাতে। টেনিদা গাঁইগুঁই করে বললে, আমাদের একদিন ছবির শুটিং দেখাবেন স্যার?

—আলবৎ—আলবৎ! যেদিন ভালো শুটিং হবে সেদিন আগে থেকে খবর দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে তোমাদের নিয়ে যাব। চাই কি, জনতার দৃশ্যে নামিয়েও দিতে পারি—

একটু হেসে বললেন, সেখানে গিয়ে যেন নস্যির কৌটো-ফৌটো বলো না যেন আবার!

—পাগল! আর বলে!—আমরা দু'জনে একসঙ্গে সাড়া দিয়ে উঠলুম।

—তা হলে আমি আসি—টা-টা—

হরিকিঙ্কর চলে গেলেন। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম, গলির মোড়ে একটা মস্ত লাল মোটর দাঁড়িয়েছিল, সেইটেতে চড়ে তিনি দেখতে দেখতে উধাও হলেন।

তখন হাতের প্যাকেট দুটো খুললুম আমরা।

কী দেখলুম ?

টেনিদার হাতের প্যাকেটে একটা ট্রানজিস্টার রেডিও আর আমার প্যাকেটে একটা ক্যামেরা।

দুটোই নতুন—ঝকঝক করছে।

আর আকাশ ফাটিয়ে টেনিদা হাঁক ছাড়ল: ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস—

আমি বললুম—ইয়াক্—ইয়াক্!

গল্প
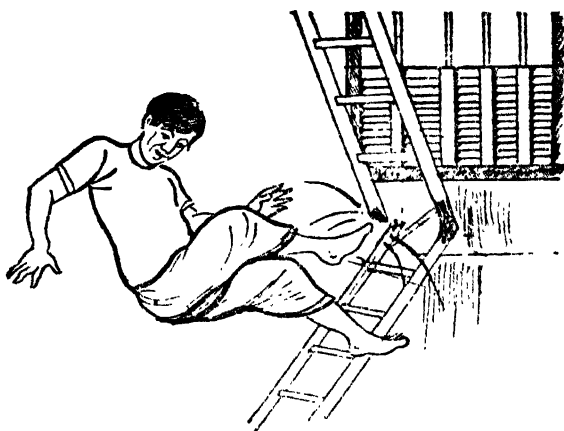
একটি জানালা খুলতে

ঘুম থেকে উঠে ঘনশ্যাম ঘোড়ুই আবিষ্কার করল, জানালাটা খোলা যাচ্ছে না।

জানলায় নতুন রং করা হয়েছিল, তার ওপর কাল রাত্তিরে গেছে ঝমঝম বিষ্টি। সেই বিষ্টিতে জানলার কাঠ ফেঁপে উঠেছে—তার কাঁচা রং-ব্রেফ বজ্র আঁটুনি যাকে বলে।

প্রথমে 'জয় গুরু' বলে ছিটকিনি ধরে টানতে লাগল, কিছুই হল না। তারপর 'জয় মা কালী' বলে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হ্যাচকা মারতে লাগল—ফল যথা পূর্বং। লাভের ভেতর পাঁকাটির মতো আঙুলগুলো খট খট করতে লাগল, হাতের তেলো লাল হয়ে ফোসকা পড়বার জো হল। গা দিয়ে কালঘাম ছুটে বেরুল। হাল ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ বসে বসে হাঁপাতে লাগল ঘনশ্যাম।

আচ্ছা প্যাঁচে পড়া গেল এই সকালবেলায়। অথচ ঘরে এই একটি মাত্র জানালা। খুলতে না পারলে আলো বাতাস সব বন্ধ, তায় আবার বাইরে থমথমে মেঘ জমাট বেঁধে আছে।

বাড়িটা দোতালা। ঘনশ্যাম ঘোড়ুই ঝোলা গুড় আর চিটে গুড়ের কারবারী, একতলায় তার দোকান গুদাম এই সব। দোতলায় এই একটি ঘর, তাতে তার শয়ন পর্ব চলে। কয়েকটা চিটে গুড়ের হাঁড়িও সাজানো

আছে একদিকে। রান্নাবান্না, সময় মত একলা বসে হিসেব-পত্তর মেলানো, সবই চলে ওই ঘরের ভেতর। অতএব সবে ধন নীলমণি জানালাটাকে খুলতে না পারলে সারাদিন লণ্ঠন জেলে রাখতে হবে। তাতে খামোকা একরাশ কেরোসিন বরবাদ।

ঘনশ্যাম জবরদস্ত কৃপণ। স্ত্রী নেই, খুব সম্ভব কিপেটেমির জ্বালায় সে বেচারা না খেয়ে মরেছে। একটা মাত্র জোয়ান ছেলে সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যোগ দিয়েছে মিলিটারীতে। সেজন্য ঘনশ্যামের কোনো দুঃখ নেই। অনেক খরচা বেঁচে গেছে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে সে। বাড়িতে একা। কর্মচারী বলতে আছে একজন মাত্র—জলধর জানা। কিন্তু সে থাকে মাইল দেড়েক দূরে। বেলা দশটা নাগাদ দোকানে আসবে। তার মানে আরো তিন ঘণ্টা ঘনশ্যামকে একা থাকতে হবে এবং তিন ঘণ্টা ধরে জানালাটাকে কিছুতেই বন্ধ রাখা যায় না।

কাজেই বাধ্য হয়ে পালোয়ান মত কাউকে ডাকা দরকার। একটা কুলিটুলি হলেই সুবিধা। কিন্তু যাকেই ডাকা যায়—কম করে অন্ততঃ চার আনা পয়সাও তাকে বকশিস দিতে হবে। ভাবতেই ঘনশ্যামের মন খারাপ হয়ে গেল।

গুটি গুটি ব্যাজার মুখে রাস্তায় বেরুল ঘনশ্যাম। আর বেরুতেই—সঙ্গে সঙ্গে খুসির হাসিতে তোবড়ানো মুখ ভরে উঠল তার। বরাত একেই বলে।

একটু দূরেই গান গাইতে গাইতে আসছে গঙ্গারাম। গঙ্গারাম হালদার। তার বিকট বাজখাই গানের তাড়ায় উর্ধ্বশ্বাসে গোটা তিনেক কুকুর ছুটে পালালো।

গঙ্গারামের মাথা মোটা, লেখাপড়া বেশিদূরে এগোয়নি। বাপের অবস্থা তার ভালো, জমি জমা আছে। ছেলের মগজ নীরেট দেখে ধর্মের নামে ছেড়ে দিয়েছে তাকে।

লেখাপড়া নাই করুক, ডন বৈঠক করে গঙ্গারাম শরীর বাগিয়েছে একখানা। তিনটে বাঘে তাকে খেয়ে শেষ করতে পারবে না। গলার আওয়াজে তার মেঘ ডাকে। পাড়ায় সখের যাত্রাটাত্রা হলে সে তাতে ভীম সাজে। পার্ট-টার্ট বিশেষ করতে হয় না, গদা ঘুরিয়ে গোটাকয়েক গর্জন করলেই আসর শুদ্ধ লোকের পিলে চমকে যায়।

ঘনশ্যাম গঙ্গারামকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। কিন্তু আজ গঙ্গারামকে দেখবামাত্র তার প্রাণ মন জুড়িয়ে গেল! ঝোলা গুড়ের চাইতেও মিঠে স্বরে ডাকল: বাছা গঙ্গারাম!

গঙ্গারাম বললে, কী বলছেন ঘনু জ্যাঠা?

—আমার ঘরের জানালাটা শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে, বাবা, কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না। একটু যদি টেনে খুলে দাও—

সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গারাম উৎসাহিত হয়ে উঠল: এ আর শক্ত কথা কী জ্যাঠা, এখুনি খুলে দিচ্ছি! জানলা তো জানলা, তোমার বাড়ির সব দরজা কব্জা শুদ্ধু টেনে খুলে বের করে দেব।

—না-না-না—ঘনশ্যাম আঁতকে উঠল: দরজা-টরজা সব ঠিক আছে, তোমায় কিছু করতে হবে না। শুধু জানলাটা খুলে দিলেই হবে।

—এতো এক মিনিটের কাজ। চলুন।

কিন্তু দেখা গেল, জানালা অত সহজেই খোলবার পাত্র নয়। দাঁত কিড়মিড় করে 'মারো জোয়ান হেঁইয়ো'! বলে ডাকাত পড়া হাঁক ছেড়ে পনেরো মিনিট সব রকম কসরৎ করে গঙ্গারামও ঘোল খেয়ে গেল। ঝপাৎ করে বসে পড়ল মেজেব উপর, ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাতে লাগল।

—অনেক জানলা দেখেছি মশাই, কিন্তু এমন বিদঘুটে বিচ্ছিরি জানালা তো কখনো দেখিনি!

—বাবা গঙ্গারাম, তুমিও পারলে না।—ঘনশ্যাম কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল: তাহলে কি ও জানালাটা আর কোনোদিন খোলা যাবে না? চিরদিনই বন্ধ হয়েই থাকবে?

গঙ্গারামের আত্মসম্মানে ঘা লাগল।

—বন্ধ থাকবে—থাকলেই হল? ইয়ার্কি নাকি? জানালা না খুলে যদি আর বাড়ি ফিরি তাহলে আমার নাম গঙ্গারামই নয়। গঙ্গারাম গোঁ গোঁ করতে লাগল। তারপর মিনিটখানেক চোখ পাকিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল: আচ্ছা, এবার—এগেন!

বলেই কাঠের চোয়ারটা হড়হড়িয়ে টেনে নিয়ে গেল। বললে—জানালার মাথার দিকটা হাতে পাচ্ছি না। ওইখানেই আটকে আছে মনে হচ্ছে। এবার মাথাটা ধরে টেনে দেখব।

চেয়ারের ওপর ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতেই—খটাং। ‘বপস্’ বলে চেঁচিয়ে উঠল গঙ্গারাম।

ব্যাপার আর কিছুই নয়। জানালার ঠিক ওপরেই দেওয়াল ঘড়ি, তার তলার দিকে ছুঁচালো অংশটা গঙ্গারামের মাথায় লেগেছে।

—এমন বাজে জায়গায় ঘড়ি রাখেন, আক্কেল-পছন্দ নেই আপনার? মাথায় হাত বুলিয়ে গঙ্গারাম বললে, আমার চাঁদি একেবারে ফুটো করে দিয়েছে। নিন—ধরুন—

কী ধরতে বলছে সেটা বোঝবার আগেই কেলেঙ্কারী ঘটে গেল একটা। গঙ্গারাম পত্রপাঠ উপড়ে আনল ঘড়িটাকে। আর ঘনশ্যাম হাঁ হাঁ করে ওঠবার আগেই ধাঁই করে পড়ে গেল মেজেতে। ঝনঝনাৎ আওয়াজ তুলে ঘড়ির বারোটা বাজল।

ঘনশ্যাম আর্তনাদ করে উঠল: একি করলি, ওরে হতভাগা একি করলি! চল্লিশ বছরের পুরানো বাবার আমলের এমন জাপানী ঘড়িটা—

—আপনাকে ধরতে বললুম। ধরলেন না কেন?—গঙ্গারাম বিকট গলায় ধমক দিলে: নিজের দোষেই ঘড়ি গেছে আপনার। এমন বেয়াড়া জায়গায় ওটাকে রাখলেনই বা কেন? এখন বেশি চেঁচামেচি করবেন না, কাজ করতে দিন।

—হায়—হায়—অমন ঘড়িটা—

—শাটাপ! গঙ্গারাম হুঙ্কার করল: ডিসটার্ব করবেন না বলে দিচ্ছি।

হুঙ্কার শুনে ঘনশ্যাম থমকে গেল। গঙ্গারাম তখন জানালার মাথাটা ধরে দারুণভাবে টানাটানি করছে। চেয়ারটা মড়মড় করে উঠল।

করুণ গলায় ঘনশ্যাম বললে, বাবা গঙ্গারাম আমি বলছিলাম, জানালা খোলবার দরকার নেই, ওটা বরং বন্ধই থাক। তুমি তো বিস্তর পরিশ্রম করলে, এবার বাড়ি যাও।

—বাড়ি যাব? জানালা না খুলেই? চেয়ার থেকে নেমে পড়ে গঙ্গারাম বললে, সে পাত্র আমাকে পাওনি। এবার আমি বুদ্ধি পেয়ে গেছি। পেছন থেকে ধাক্কা দিলেই জানালা খুলে যাবে।

—কিন্তু দোতলার জানালা যে! ধাক্কা দেবে আকাশ থেকে নাকি?

—আকাশ থেকে কেন? মইয়ে চেপে!

—মই? মই আমি কোথায় পাব?

—মই আছে। ওপাশে রামকানাই কাকার বাড়িতে। নিয়ে আসছি।

—রামকানাই ?—ঘনশ্যাম বিষম খেলো : রামকানাইয়ের সঙ্গে আমার যে দু বছর মুখ দেখাদেখি বন্ধ, দারুণ ঝগড়া। কক্ষনো মই দেবে না।

—দেয় কিনা দেখছি—বলে গঙ্গারাম টুক করে একটা পেতলের ঘটি তুলে নিয়ে বললো—এইটে জামিন রেখে নিয়ে আসব।

—আহা-হা, করছ কী! অনেক দাম ও ঘটিটার। ওহে ও গঙ্গারাম—

আর গঙ্গারাম! তিন লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। যাবার সময় বলে গেল, ঘরটা ততক্ষণ সাফ করে ফেলুন আপনি। বিস্তর ভাঙা কাঁচ, পায়ে ফুটলে মারা পড়বেন।

ঘর সাফ করা মাথায় রইল, ঘনশ্যামও ছুটে বেরুল পিছনে। কিন্তু গঙ্গারামকে ঠেকায় কার সাধ্য! ঠিক তিন মিনিটের মধ্যেই ঘটি জামিন রেখে সে মই নিয়ে এল রামকানাইয়ের কাছ থেকে।

কাতর স্বরে ঘনশ্যাম বললে, দোহাই বাবা গঙ্গারাম, জানালা যেমন আছে থাক, তুমি মই ফেরৎ দিয়ে আমার ঘটি নিয়ে এসো।

—আনবো'খন। ঘটি তো পালাচ্ছে না। আপনি একটু চুপ করে থাকুন না ঘনু জ্যাঠা—দেখুন না আমি—কথাটা শেষ হল না। তার আগেই মচ্—মচ—মড়াৎ!

দেওয়ালে মই রেখে উঠতে চেষ্টা করছিল গঙ্গারাম। তিন চারটে ধাপ উঠতে না উঠতেই মই ভাঙল। হুড়মুড় করে পড়তে গিয়ে গঙ্গারাম সামলে নিলে কোনোমতে।

—মই গেল! ঘনশ্যাম গগনভেদী হাহাকার করে উঠল : তাহলে আমার ঘটিটা·

—ঘটিও গেল। তাতে আর কী হয়েছে! একটা পুরানো ঘটি গেল। তিনটে নতুন কিনতে পারবেন!

ঘনশ্যামকে সান্ত্বনা দিয়ে গঙ্গারাম বললে—কিন্তু ব্যাপারটা কী জানেন ঘনু জ্যাঠা—জানালা ওই ভেতর থেকেই খুলতে হবে।

—না, জানালা খুলতে হবে না! ঘনশ্যাম তারস্বরে বললে, জানালা আমি কিছুতেই খুলব না। কোনদিন খুলব না, কাউকে খুলতে দেব না। তুমি এখন দয়া করে যাও—আমাকে রেহাই দাও!

—জানালা আমি খুলবই—না খুলে যাব না! হুঁ হুঁ এ আমার ভীমের

প্রতিজ্ঞা!—গঙ্গারাম তার আটচল্লিশ ইঞ্চি বুক দু'হাতে থাবড়ে নিলে একবার! জানালা খুলবে, তবে আমি নড়ব এখান থেকে। কিন্তু খুলতে হবে ভেতর থেকেই। শুধু একগাছা দড়ি যদি পাই—

—দড়িটড়ি নেই। আকাশ মেঘে অন্ধকার করে এসেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তুমি বাড়ি যাও গঙ্গারাম!

—ছোঃ বজ্র বিদ্যুৎ! ও সবে আমার কী হবে?

গঙ্গারাম তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল: যদি কেবল একগাছা দড়ি পাই—ইয়াঃ, ওই তো দড়ি!

…আরে—আরে—আরে—

ঘনশ্যাম চিৎকার করতে লাগল, কিন্তু তার আগেই দরজার সামনে বাঁধা তার গোরুর গলা থেকে দড়ি খুলে ফেলল গঙ্গারাম।

—আরে গোরুটা বড্ড পাজী, একবার ছুটলে আর ধরা যায় না ওটা—

ঘনশ্যামের চিৎকারেই কিনা কে জানে—

দড়ি খোলা পাওয়া মাত্র গোরু প্রাণপণে ছুটল। চার পা তুলে চক্ষের পলকে উধাও হয়ে গেল মাঠের দিকে।

—ধরো—ধরো, গোরু ধরো আগে—

চোখ পাকিয়ে এবার আকাশ ফাটানো হাঁক ছাড়ল গঙ্গারাম।

—গোরু ধরবেন আপনি, আমি কেন? আমি তো জানালা খুলব। লুক হিয়ার ঘনু জ্যাঠা, আমার কাজে সমানে বাধা দিচ্ছেন আপনি। ফের যদি একটাও কথা বলেন—সামনের এই ভরা পুকুর দেখতে পাচ্ছেন? ঠ্যাং ধরে সোজা ওর ভেতর ছুঁড়ে ফেলে দেব!

—আমি পথে বসলাম—ভাঙা গলায় এই কথা বলে ঘনশ্যাম রাস্তার মধ্যেই বসে পড়ল।

কিন্তু বসেও কি থাকবার যো আছে? গঙ্গারাম দড়ি নিয়ে দোতলায় চড়েছে। কাজেই ঘনশ্যামকেও রুদ্ধশ্বাসে পিছু নিতে হল।

তড়িৎকর্মা গঙ্গারাম এবার জানালার কড়ার সঙ্গে গোরুর দড়ি বেঁধে ফেলল শক্ত করে।

—এইবার, এইবার যাবে কোথায়? মারো টান—টানো—আরো জোর ঘোঁ—ঘো—ঘোৎ…টান—টান—টা—কড়াৎ…

শেষ কড়াৎটা দড়ি ছেঁড়বার শব্দ।

শুধু দড়িই ছিঁড়লো না—চিৎ হয়ে ছিটকে পড়ল গঙ্গারাম। পড়ল ঘনশ্যামের ওপর। ঘনশ্যাম পড়ল কোণায় থরে থরে সাজানো চিটে গুড়ের হাঁড়ির ওপর। একসঙ্গে চারটে হাঁড়ি ভাঙল, চিটে গুড় মেখে ভূত হয়ে ভালো করে উঠে বসবার আগেই—

বাইরের মেঘে থমথম আকাশ থেকে ছুটে এল ঝোড়ো বাতাস। এল বোধ হয় সত্তর মাইল স্পীডে।

আর এতক্ষণে বন্ধ জানালাটা সেই হাওয়ার ধাকায় বাজের মতো শব্দ করে খুলে গেল।

দশানন-চরিত

আমি খুব উত্তেজিত হয়ে এসে টেনিদাকে বললুম, 'হ্যারিসন রোডে লোকে একটা পকেটমারকে ধরেছে।'

টেনিদা আমার দিকে কি রকম উদাসভাবে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।

'তারপর?'

'তারপর আর কি! থানায় নিয়ে গেল।'

'লোকে পিটতে চেষ্টা করেনি?'

'করেনি আবার? ভাগিস একজন পুলিস এসে পড়েছিল। সে হাতযোড় করে বললে, দাদারা, মেরে আর কী করবেন? মার খেয়ে খেয়ে এদের তো গায়ের চামড়া গণ্ডারের মতো পুরু হয়ে গেছে। অনর্থক আপনাদেরই হাতে ব্যথা হয়ে যাবে। তার চাইতে ছেড়ে দিন—এ মাসখানেক জেলখানায় কাটিয়ে আসুক, ততদিন আপনাদের পকেটগুলো নিরাপদে থাকবে।'

'বেশ হয়েছে।'—বলে টেনিদা গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর মস্ত একটা ঠোঙা থেকে একমনে কুড়কুড় করে ডালমুট খেতে লাগল।

আমি ওর পাশে বসে পড়ে বললুম, 'আমাকে ডালমুট দিলে না?'

'তোকে?'—টেনিদা উদাস হয়ে ডালমুট খেতে খেতে বললে, 'না—তোকে দেবার মতো মুড্ নেই এখন। আমি এখন ভীষণ ভাবুক-ভাবুক বোধ করছি।'

'ভাবুক-ভাবুক!'—শুনে আমার খুব উৎসাহ হল: 'তুমি কবিতা লিখবে বুঝি?'

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, 'দুত্তোর কবিতা! ও-সবের মধ্যে আমি নেই। যারা কবিতা লেখে—তারা আবার মনিষ্যি থাকে নাকি? তারা রাস্তায় চলতে গেলেই গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়, নেমন্তন্ন-বাড়িতে তাদেরই জুতো চুরি হয়, বোশেখ মাসের গরমে যখন লোকের প্রাণ আইঢাই করে—তখন তারা দোর বন্ধ করে পদ্য লেখে—"বাদল রাণীর নুপুর বাজে তাল-পিয়ালের বনে!" দুদ্দুর!'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'বোশেখ মাসের দুপুরে বাদল রাণীর কবিতা লেখে কেন?'

টেনিদা মুখটাকে ডিমভাজার মতো করে বললে, 'এটাও বুঝতে পারলি না? বোশেখ মাসে কবিতা লিখে না পাঠালে আষাঢ় মাসে ছাপা হবে কী করে? যা—যা, কবিতা লেখার কথা আমাকে আর তুই বলিস নি। যত্তো সব ইয়ে—!'

আমি বললুম, 'তবে তুমি ও-রকম ভাবুক-ভাবুক হয়ে গেলে কেন?'

'ওই পকেটমারটার কথা শুনে।'

'পকেটমারের কথা শুনে কেউ ভাবুক হয় নাকি আবার?'—আমি বললুম, 'সবাই তো তাকে রে-রে করে ঠ্যাঙাবার জন্যে দৌড়ে যায়। আমারও যেতে ইচ্ছে করে। এই তো সেদিন হাওড়ার ট্রামে আমার বড়ো পিসেমশায়ের পকেট থেকে—'

'ইউ শাট আপ্ প্যালা—' টেনিদা চটে গেল: 'কুরুবকের মতো সব সময় বকবক করবি না—এই বলে দিচ্ছি তোকে। পঞ্চাননের ঠাকুর্দা দশাননের কথা যদি জানতিস, তা হলে বুঝতে পারতিস—এক-একটা পকেটমারও কী বলে গিয়ে—এই মহাপুরুষ হয়ে যায়।'

'কে পঞ্চানন? কে-ই বা দশানন? আমি তো তাদের কাউকেই চিনি না।'

'দুনিয়া-শুদ্ধ সবাইকে তুই চিনিস নাকি? জাপানের বিখ্যাত গাইয়ে তাকানাচিকে চিনিস তুই?'

আমি বললুম, 'না।'

'লণ্ডনের মুর্গীর দোকানদার মিস্টার চিকেনসনের সঙ্গে তোর আলাপ আছে?'

'উঁহু।'

'ফ্রান্সের শানাইওলা মসিয়ো প্যাঁকে দেখেছিস কোনো দিন?'

'না—দেখিনি। দেখতেও চাই না কখনো।'

'তা হলে?'—টেনিদা আলু-কাবলীর মতো গম্ভীর হয়ে গেল: 'তা হলে পঞ্চাননের ঠাকুর্দা দশাননকেই বা তুই চিনবি কেন?'

'ঢের হয়েছে, আর চিনতে চাই না। তুমি যা বলছিলে বলে যাও।'

'বলতেই তো যাচ্ছিলুম—' টেনিদা আবার কিছুক্ষণ কুড়মুড় করে ডালমুট চিবিয়ে ঠোঙাটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে, 'খা। আমি তোকে ব্যাপারটা বলি ততক্ষণে।'

আমি ঠোঙাটা হাতে নিয়ে দেখলুম খালি। ফেলে দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি একেবারে নীচের দিকে, টেনিদার চোখ এড়িয়ে কী করে একটা চীনে বাদামের দানা আটকে আছে। সেটা বের করেই আমি মুখে পুরে দিলুম। আড়চোখে দেখে টেনিদা বললে, 'ইস, একটা বাদাম ছিল নাকি রে? একদম দেখতেই পাই নি। যাক গে, ওটা তোকে বকশিশ করে দিলুম।'

আমি বললুম, 'সবই পঞ্চাননের ঠাকুর্দা দশাননের দয়া।'

টেনিদা বললে, 'যা বলেছিস। আচ্ছা, এবার দশাননের কথাই বলি।'

—'বুঝলি, কখনো যদি তুই ঘুঁটেপাড়ায় যাস—'

আমি বললুম, 'ঘুঁটেপাড়া আবার কোথায়?'

'সে গোবরডাঙা থেকে যেতে হয়—সাত ক্রোশ হেঁটে। মানে, যাওয়া খুব মুশকিল। কিন্তু যদি কখনো যাস—দেখবি দশানন হালদারের নাম শুনলে লোকে এখনো মাটিতে মাথা নামিয়ে পেন্নাম করে। বলে, 'এমন ধার্মিক, এমন দানবীর আর হয় না। ইস্কুল করেছেন, গরিব-দুঃখীকে দুবেলা

খেতে দিয়েছেন, মন্দির গড়েছেন, পুকুর কেটেছেন।' কিন্তু আসলে এই দশানন কে ছিল, জানিস? এক নম্বরের পকেটমার।'

'পকেটমার?'

'তবে আর বলছি কী? অমন ঘোড়েল পকেটমার আর দুজন জন্মেছে কিনা সন্দেহ। পাঠশালায় যেদিন প্রথম পড়তে গেল, সেদিনই পণ্ডিত-মশাইয়ের ফতুয়ার পকেট থেকে তাঁর নস্যির ডিবে চুরি করে নিলে। পণ্ডিত তাকে কষে বেত-পেটা করে তাড়িয়ে দিলেন। বাপ-কাকা-দাদা—তার হাত থেকে কারো পকেটের রেহাই ছিল না। যত পিট্টি খেত, ততই তার রোখ চেপে যেত। শেষে যখন একদিন বাড়ীতে গুরুদেব এসেছেন আর দশানন তার ট্যাঁক থেকে প্রণামীর বারো টাকা ছ'আনা পয়সা মেরে নিয়েছে—সেদিন দশাননের বাপ শতানন হালদারের আর সইল না। বাড়ীর মোষবলির খাঁড়াটা উঁচিয়ে দশাননকে সে এমন তাড়া লাগাল যে দশানন এক দৌড়ে একেবারে কলকাতায় পৌঁছে তবে হাঁফ ছাড়ল।

আর জানিস তো, কলকাতা মানেই পকেটমারের স্বর্গ। অনেক গুণী লোক তো আগে থেকেই ছিল, কিন্তু বছরখানেকের ভেতরে দশানন তাদের সম্রাট হয়ে উঠল। তার উৎপাতে লোকে পাগল হয়ে গেল। টালা থেকে টালীগঞ্জ আর শেয়ালদা থেকে শাল্‌কে পর্যন্ত, কারুর পকেটের টাকা-কড়ি কলম থেকে মায় সুপুরির কুচি কিংবা এলাচ-দানা পর্যন্ত বাদ যেত না।

ধরা যে পড়ত না, তা নয়। দু মাস ছ মাস জেল খাটত, তারপর বেরিয়ে এসে আবার যে-কে সেই। পুলিসশুদ্ধু জেরবার হয়ে উঠল। তখন দেশে ইংরেজ রাজত্ব ছিল, জানিস তো? পুলিস কমিশনার ছিল এক কড়া সাহেব—মিস্টার প্যাম্বার না কী যেন নাম। লোকে তার কাছে গিয়ে ধর্ণা দিতে লাগল। প্যাম্বার তাদের বললে, 'পকেটমারকে ফাঁসি ডেওয়া যায় না—নটুবা আমি ডশাননকে টাই ডিতাম। এবার ঢরিতে পারিলে টাহাকে এমন শিক্ষা ডিব যে সে আর পকেট কাটিবে না।'

ধরা অবশ্য দশানন ক'দিন বাদেই পড়ল। পকেটমারের ব্যাপার তো জানিস, ওরা প্রায়ই জেলে গিয়ে মুখ বদলে আসে—ওদের ভালোই লাগে বোধ হয়। কিন্তু এবার দশানন ধরা পড়বামাত্র তাকে নিয়ে যাওয়া হল প্যাম্বার সাহেবের কাছে। সাহেব বললে, 'ওয়েল ডশানন, টুমি টো কলিকাটায় লোককে আর ঠাকিটে ডিবে না। টাই এবার টোমার একটা

পাকা বণ্ডোবসটো করিটেছি।'—এই বলে সে হুকুম দিলে, 'ইহাকে লঞ্চে করিয়া লইয়া গিয়া সুণ্ডরবনে (মানে—সুন্দরবনে) ছাড়িয়া ডাও—সেখানে গিয়া এ কাহার পকেট মারে ডেখিব। বাঘের তো আর পকেট নাই।'

দশানন অবশ্য বিস্তর কান্নাকাটি করল, 'আর করব না স্যার—এ যাত্রা ছেড়ে দিন স্যার'—বলে অনেক হাতে পায়ে ধরল, কিন্তু তাতে চিঁড়ে ভিজল না। সাহেব ঠাট্টা করে বললে, 'যাও—বাঘের পকেট মারিটে চেষ্টা করো। যডি পারো, টোমাকে রায় সাহেব উপাটি ডিব।'

তারপরে আর কী? পুলিস লঞ্চে করে দশাননকে নিয়ে গেল সুন্দরবনে। সেখানে তাকে নামিয়েই তারা দে-চম্পট। তাদেরও তো বাঘের ভয় আছে।

এদিকে দশাননের তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া। জলে গিজগিজ করছে কুমির—ঝোপে ঝোপে মানুষখেকো বাঘ—সুন্দরবন মানেই যমের আড়ত। এর চাইতে সাহেব যে তাকে ফাঁসিতে ঝোলালেও ভালো করত!

বেলা পড়ে আসছিল, একটু দূরেই কোথায় হালুম-হালুম ডাক শোনা গেল। দশানন একেবারে চোখ-কান বুজে ছুটল। সুঁদরী গাছের শেকড়ে হোঁচট খেয়ে, গোলপাতার ঝোপে আছাড় খেয়ে—দৌড়োতে দৌড়োতে দেখে সামনে এক মস্ত ভাঙা বাড়ী। আদ্যিকালের পুরোনো—ইট-কাঠ খসে পড়ছে, তবু অনেকখানি এখনো দাঁড়িয়ে। মরীয়া হয়ে দশানন ঢুকে গেল তারই ভেতরে। হাজার হোক, বাড়ী তো বটে!

ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠতেই দেখে সামনে একটা মস্ত ঘর। দরজায় তার মাকড়শার জাল, ভেতরে কত জন্মের ধুলো। তবু ঘরটা বেশ আস্তো আছে। একটু সাফসুফ করে নিলে শোওয়াও যাবে একপাশে। দেশলাই জ্বেলে, সাবধানে সব দেখে নিলে দশানন। না—সাপ-খোপ নেই। আর দোতলার ঘর—বাঘও চট করে এখানে উঠে আসবে না। শুধু দশানন ঘরে ঢুকতে ঝটপট করে কতগুলো চামচিকে বেরিয়ে এল—তা বেরুক, চামচিকেকে তার ভয় নেই।

ক্যানিঙের বাজার থেকে পুলিস তাকে এক চাঙারি খাবার দিয়েছিল, মনের দুঃখে তাই খানিকটা খেল দশানন। বাইরে তখন ধুন্ধুমার অন্ধকার নেমেছে। ঝিঁঝি ডাকছে, পোকা ডাকছে—অনেক দূর থেকে বাঘের ডাকও আসছে। 'জয় মা কালী' বলে কাপড় জড়িয়ে ঘরের এক কোণায় শুয়ে পড়ল দশানন। রাতটা তো কাটুক—কাল সকালে যা হয় দেখা যাবে।

বাঘের ডাক, ঝিঁঝির শব্দ, জঙ্গলের পাতায় পাতায় হাওয়ার আওয়াজ আর মশার কামড়ের ভেতরে ভয়ে ভাবনায় কখন যে দশানন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না। কতক্ষণ ধরে ঘুমুচ্ছিল, তাও না। হঠাৎ এক সময়ে সে চমকে জেগে উঠল। দেখল ভাঙা জানলা দিয়ে ঘরের ভেতরে জ্যোৎস্না পড়েছে—আর সেই জ্যোৎস্নার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক বিরাট পুরুষ। তার পোশাক-আশাক থিয়েটারের মোগল সেনাপতির মতো। মুখে লম্বা দাড়ি, মাথায় পাগড়ি। আগুনের মতো তার চোখ দুটো দপ্-দপ্ করে জ্বলছে।

দশাননের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বুঝতে বাকী রইল না—ওটা ভূত। তাও যে-সে ভূত নয়—একেবারে মোগলাই ভূত।

ভূত বাজখাঁই বললে, "এই বেত্মিজ, তুই কে রে? আমার প্রাসাদে ঢুকেছিস কেন?"

দশানন একটু সামলে নিলে। উঠে সামনে এসে একেবারে মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করলে ভূতকে। বললে, 'হুজুর, আমায় মাপ করবেন। আমি কিছুই জানতুম না। সন্ধ্যেবেলায় বাঘের ভয়ে ছুটতে ছুটতে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছি। দয়া করে রাতটার মতো আমায় থাকতে দিন। ভোরে উঠেই চলে যাব।"

ভূত খুশি হল। চাপদাড়ির ফাঁকে হেসে বললে, "ঠিক আছে, থেকে যা। তুই যখন আমার আশ্রয় নিয়েছিস, তখন তোকে কিছু বললে আমার গুণাহ্ (মানে পাপ) হবে। কিন্তু তোর বাড়ী কোথায়?"

"আজ্ঞে বাংলাদেশে।"

"বেশ—বেশ, উঠে দাঁড়া।"

দশানন উঠে ভূতের সামনে দাঁড়াল। ভূত খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল তাকে। তারপর বললে, "তোর বেশ সাহস-টাহস আছে দেখছি। আমার একটা কাজ করতে পারবি?"

"আজ্ঞে, হুকুম করলেই পারি।"—দশানন খুব বিনীত হয়ে হাত কচলাতে লাগল।

"তুই একবার নবাব সিরাজদ্দৌল্লার কাছে যেতে পারিস?"

"আজ্ঞে কার কাছে?"—দশানন ঘাবড়ে গেল।

"কেন—বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজদ্দৌল্লার নাম শুনিসনি?"—ভূত খুব আশ্চর্য হল: "তুই কোথাকার গাধা রে!"

"নাম জানি বই কি হুজুর, বিলক্ষণ জানি।"—দশানন মাথা চুলকে বললে, "কিন্তু তিনি তো অনেকদিন আগে মারা গেছেন—আমি কী করে তাঁর কাছে—"

"মারা গেছেন? নবাব সিরাজদ্দৌল্লা! সে কি রে! পলাশীর যুদ্ধের পরে তিনি রাজমহলের দিকে রওনা হলেন, আমাকে বললেন—'মন্‌সবদার জবরদস্ত খাঁ, তুমি আমার এইসব মণিমুক্তাগুলো নিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকো এখন। আমি এরপরে আবার ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করব, তখন তোমাকে দরকার হবে—তোমায় আমি ডেকে পাঠাব। ততক্ষণ তুমি তোমার সুন্দরবনের প্রাসাদে গিয়ে লুকিয়ে থাকো।' সেই থেকে আমি আছি এখানে। কবে আমার এন্তেকাল (মানে মৃত্যু) হয়েছে, কিন্তু নবাবের ডাক শোনবার জন্যে আমি বসে আছি, আর আমার দুই জেবে (মানে পকেটে) লাখ লাখ টাকার হীরে-মোতি বয়ে বেড়াচ্ছি। দেখবি?"

বলেই জবরদস্ত খাঁ তার জেবের পকেট থেকে দু-হাত ভর্তি করে মণিমুক্তো বের করল। চাঁদের আলোয় সেগুলো ঝলমল করতে লাগল, দেখে চোখ ঠিকরে বেরুল দশাননের। মাথা ঘুরে যায় আর কি!

জবরদস্ত খাঁ সেগুলো আবার পকেটে পুরে বললে—"আর তুই বলছিস, নবাব নেই? না—হতেই পারে না। তা হলে নিজেকেই এবার আমায় খুঁজতে যেতে হচ্ছে।"

দশানন চুপ করে রইল।

জবরদস্ত খাঁ বললে, "প্রথমে যাই মুর্শিদাবাদ, তারপরে যাব রাজমহল, তারপর মুঙ্গের পর্যন্ত ঘুরে আসব। তুই আজ রাতে আমার প্রাসাদে থাকতে পারিস। কোনো ভয় নেই—মন্‌সবদার জবরদস্ত খাঁর মঞ্জিলে বাঘও ঢুকতে সাহস পাবে না। কিন্তু কাল সকালেই কেটে পড়বি। ফিরে এসে যদি দেখি তুই রয়েছিস, তা হলে তক্ষুণি কিন্তু তোর গর্দান নিয়ে নেব।"

এই বলেই, জবরদস্ত খাঁ ধাঁ করে চাঁদের আলোর মধ্যে মিশে গেল।

আর দশানন? যা থাকে কপালে বলে, তক্ষুণি বেরিয়ে পড়ল ভূতের বাড়ী থেকে। অন্ধকারে খানিক হেঁটে একটা গাছে উঠে রাত কাটালে। সকালে নদীর ধারে গিয়ে দূরে একটা জেলেদের নৌকো চোখে পড়ল তার—বিস্তর ডাকাডাকি করে, তাদের নৌকোয় উঠে দেশে চলে এল।

আর তারপর?

তারপর দেশে ফিরে অতিথিশালা করল, পুকুর কাটালো, গরিবকে দান-ধ্যান করতে লাগল, মহাপুরুষ হয়ে গেল—

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'বা রে, টাকা পেল কোথায় ?'

'টাকার অভাব কি রে গর্দভ ? জবরদস্ত খাঁর পকেট মেরে এক থাবা মণিমুক্তো তুলে নিয়েছিল না ?'

'অ্যা !'—আমি খাবি খেলুম : 'ভূতের পকেট কেটে ?'

'যে কাটতে পারে—ভূতের পকেটই বা সে রেয়াৎ করবে কেন ?'—টেনিদা হাসল : 'অমন এক্স্পার্ট হাত ! কিন্তু ওইতেই তো তার স্বভাব-চরিত্তির একেবারে বদলে গেল। স্বয়ং নবাব সিরাজাদ্দৌল্লার মণি-মুক্তো - সেগুলো কি আর বাজে খরচ করা যায় রে ? ও-সব বেচে লাখ লাখ টাকা পেলো দশানন; আর তাই দিয়ে পারের উপকার করতে লাগল—মহাপুরুষ বনে গেল একেবারে।'

'আর প্যাম্বার সাহেব ?'

'বাঘের পকেট কাটলে রায়সাহেব উপাধি দেবে বলেছিল, ভূতের পকেট কেটেছে জানলে তো মহারাজা-টহারাজা করে দিত। কিন্তু জানিস তো—ইংরেজ নবাবের শত্রু। শুনলেই কেড়ে নিত ওগুলো। তাই বলছিলুম প্যালা, পকেটমারকেও তুচ্ছ করতে নেই, সেও যে কখন কী হয়ে যায়—'

আমি বললুম, 'বাজে কথা—সব বানানো।'

'বানানো ?'—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, 'ইউ প্যালো—ইউ গেট আউট—।'

গেট-আউট আর কী করে হয়, রাস্তার ধারেই তো বসেছিলুম দু-জনে। আমি টেনিদার গাঁট্টা এড়াবার জন্যে ঝাঁ করে পটলডাঙা স্ট্রীটে লাফিয়ে পড়লুম।

হারপুন

সাহিত্যিক রামগতিবাবু কলকাতার বাইরে বেড়াতে এলেন।

কলকাতার গণ্ডগোলে ভদ্রলোকের যেন দম আটকে যাওয়ার জো হয়েছিল। লেখার তাগিদ, প্রকাশকের তাড়া, সভা-সমিতির হাঙ্গামা— উঃ! এর মধ্যে মানুষ বাঁচে কখনো। এইবারে নিশ্চিন্তে একটি মাস কাটিয়ে যাবেন এখানে। বেড়াবেন, ঘুমোবেন, নিজের হাতে বাজার করে ইচ্ছেমতো খাওয়া-দাওয়া করবেন আর সময় সুযোগমতো মনের আনন্দে দুটো একটা গল্প-কবিতা লিখবেন।

বাসাটিও পেয়েছেন বেশ মনের মতো। ছোটো বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। সামনে লন আর ফুলের বাগান—বড়ো বড়ো গোলাপ ফুটে বাগান যেন আলো হয়ে আছে। বসবার জন্যে পাথরের বেদী। সেখানে বসলে দূরে নীল পাহাড়ের সারি দেখা যায়—তাদের কোলে মেঘ খেলে বেড়াচ্ছে আর ছোট্ট একটি নদী পাহাড়ের বুক চিরে রুপোর পৈতের মতো নেমে এসেছে।

বিকেল বেলা রামগতিবাবু লনের বেদীতে বসে এক পেয়ালা চায়ে চুমুক দিয়েছেন আর পাহাড়ের শোভা দেখছেন, এমন সময় শুনতে পেলেন, আসতে পারি স্যার?

রামগতিবাবু মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, বছর বাইশেকের একটি ছেলে। পরণে পাজামা, গায়ে ঝোলা আদ্দির পাঞ্জাবী, কাঁধে সাদা শাল। ঘাড়ের দুপাশে বাবরী চুল, নাকের তলায় সরু একটি গোঁফের রেখা।

ছেলেটি আবার বললে, আসব স্যার ?

গেট পেরিয়ে ভেতরে যখন ঢুকেই পড়েছে তখন না আসতে বলার কোন মানেই হয় না। রামগতিবাবু বলেন, আসুন—আসুন।

ছেলেটি এসেই তাঁর পায়ের ধুলো নিলে, তারপর হাতটা একবার জিভে ঠেকালো। গদগদ হয়ে বললে, কতদিন দূরের থেকে দেখেছি, আজ পদধূলি পেয়ে জীবন ধন্য হল।

—আপনি আমাকে চেনেন নাকি ?

—বিলক্ষণ!—ছেলেটি চোখ কপালে তুলল: দিকপাল লেখক রামগতি সমাজপতিকে বাংলাদেশে কে না চেনে। কাল যখন ট্রেন থেকে আপনি নামলেন, তখনই দেখেছি। কোথায় উঠেছেন খোঁজ নিয়ে আজ দেখা করতে এলাম। আমি স্যার, আপনার লেখার দারুণ ভক্ত। আপনার উপন্যাস পড়ে আমার মনে হয় আপনি বঙ্কিমের চাইতেও বড় লেখক, আপনার অনেক কবিতা স্যার, রবিঠাকুরের চেয়েও ভালো।

রামগতিবাবু দারুণ খুশি হলেন—পত্রিকার সম্পাদক আর প্রকাশকেরা কথাটা শুনলে কাজ হত। একটু লজ্জাও পেলেন সেই সঙ্গে। বললেন, না-না, অতটা বাড়িয়ে বলবেন না, আমি একজন সামান্য লেখক—

—সামান্য! কী বলেন আপনি! আমার তো মনে হয় আপনাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত।

রামগতিবাবুর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। হতচ্ছাড়া বাংলাদেশের লোক কি তা বোঝে! কখনো কখনো দু-একটা সমালোচক তাঁর বইয়ের এমন নিন্দে-মন্দ করে যে, মনের দুঃখে লেখা-টেথা ছেড়ে দিয়ে তাঁর সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছে করে। রামগতিবাবু বললেন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন—বসুন। চা খাবেন একটু ?

—আপনার এখানে চা খাব ? এ তো স্যার, আমার স্বপ্নের অতীত। তবে দয়া করে আমাকে আর 'আপনি' বলবেন না। আমার নাম ভজনলাল পতিতুণ্ডি—আপনি আমায় ভজু বলেই ডাকবেন।

রামগতিবাবু ভজুর জন্যে চা আনলেন। কিন্তু এমন ভক্তকে কি শুধু চা

খাওয়ালেই চলে? চারখানা বিস্কুট আর ডবল ডিমের একটা ওমলেট্ও খাওয়াতে হল। দেখা গেল ভজনলাল ভোজন আর ভক্তি কোনটাতেই পেছপা নয়। বেশ চেটেপুটেই খেলো। আর আর-একটা ডবল ডিমের ওমলেট পেলেও তার অপত্তি হত না বলেই রামগতিবাবুর মনে হল। কিন্তু ভরসা করে গিন্নীকে সে কথা তিনি বলতে পারলেন না—হয়তো বা খ্যাঁক খ্যাঁক করে চেঁচিয়েই উঠবেন ভদ্রমহিলা।

খেয়ে-দেয়ে খুশি হয়ে ভজু হাত কচলাতে লাগল।

—আচ্ছা স্যার—

—বলো!

আহ্লাদে গলায় ভজু বললে, এত সব আইডিয়া আপনার মাথায় কী করে আসে? ওই যে আপনার 'কে তুমি পথিক' উপন্যাসের এক জায়গায় লিখেছেন—'এমন সময় হুলো বেড়ালটার আর্তনাদ যেন নীরব তিমিরের বুকে হারকুন বিদ্ধ করল'—কী অদ্ভুত সে জায়গাটা। পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আচ্ছা, হারকুন নামে কী? তুরপুন বোধ হয়?

রামগতিবাবু বললেন, না—না, তুরপুন নয়। হারকুনও নয়, লিখেছি হারপুন। মানে এক রকম বল্লম—তাই দিয়ে তিমিমাছ শিকার করে।

—তিমিমাছ—অ্যাঁ?—কী কাণ্ড!—ভজুর চোখ দুটো একসঙ্গে যেন নাকের ওপর লাফিয়ে উঠে তারপরে তার দু কানের দিকে দৌড়ে গেল: বুঝেছি এইবারে। তিমির থেকে একেবারে তিমি মারা তারপুন। কী আশ্চর্য—একেই বলে কল্পনা! তারপুন! ওফ্!

—ওটা তারপুন নয়, হারপুন।—রামগতিবাবু সংশোধনের প্রয়াসী হলেন।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, হারপুন। আমি তো স্যার রাত্রে হুলো বেড়ালের ডাক শুনলে লাঠি নিয়ে তাড়া করি। আর আপনি কিনা একেবারে—ওফ্! মানে একেবারে হারতুন দিয়ে তিমিমাছ শিকার করে বসলেন!

—হারতুন নয়—হারপুন।

—ঠিক ঠিক—হারপুন! আমি তো স্যার, কখনো তিমিমাছ শিকার করিনি আপনার মতো। জানব কী করে! উঃ—আপনি কিন্তু অসাধারণ লোক! তাই তো বলি, খালি ঘরে বসে থাকলেই কি লেখক হওয়া যায়! ডালমুট চিবিয়ে আর চা খেয়ে কি কেউ অত ভালো ভালো জিনিস লিখতে পারে। কারপুন দিয়ে তিমিমাছ শিকার করতে পারলে তবেই না—

—কারপুন নয়, হারপুন।—এবার রামগতি একটু বিরক্ত হলেন।

—ঠিক ঠিক। সত্যি বলতে কি স্যার, আপনাকে দেখে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। আপনি বড় লেখক তা জানতুম, কিন্তু তিমিমাছও মারতে পারেন তা কে ভেবেছিল? আচ্ছা স্যার, রবি ঠাকুর এত বড় কবি হলেন কী করে? উনিও বোধহয় গণ্ডার জলহস্তী এই সব শিকার করতেন—তাই নয়?

—না, রবীন্দ্রনাথ কখনো গণ্ডার জলহস্তী শিকার করেন নি।—রামগতিবাবু গম্ভীর।

—তাহলে কি ঘোড়া শিকার করতেন? তাই বোধহয় 'ঘোড়া' বলে একখানা কবিতার বই লিখেছিলেন। কিন্তু ঘোড়া কি কেউ শিকার করে?—ভজনলাল দারুণ ভাবে চিন্তা করতে লাগল: ঘোড়া শিকার করবার জিনিষ নয়। বাঘ সিঙ্গির মতো কাউকে তো কখনো কামড়েছে বলে শুনিনি। তাহলে খামোকা ঘোড়া শিকার করে—

রামগতিবাবু আরো বিরক্ত হলেন: আঃ, কী যে বকো—

—অ্যাঁ, কী বললেন? বক? ঘোড়া নয়? রবীন্দ্রনাথ বক মারতেন?

—তোমার মাথায় কিছু নেই!—এতক্ষণে রামগতিবাবু ধৈর্য হারালেন, চা আর ওমলেট নেহাৎই বাজে খরচ হয়েছে বলে মনে হল তাঁর: রবীন্দ্রনাথ বক মারতেন কে বলেছে তোমায়? তাঁর বইটার নাম 'ঘোড়া' নয়—গোরা। সেটা কবিতার বই নয়, উপন্যাস। আচ্ছা তুমি এখন আসতে পারো।

—যাব স্যার? যেতে বলছেন?—এই সাহিত্যিক সদালাপে এমন ভাবে বাধা পড়ায় ভজু ব্যথা পেলো: আপনি আমায় যেতেই বলছেন তবে?

—হুঁ, যেতেই বলছি তোমায়। দয়া করে আমায় রেহাই দাও এখন।

—ওঃ, লিখতে বসবেন বুঝি? তৈরি করবেন বাংলা সাহিত্যের আর একখানা অ্যাটম বোমা? এ বইতে তারকুন দিয়ে কী মারবেন স্যার? হাতি? ভজু তখনো কৌতুহলী।

—সিংহ—সিংহ মারব!—এবার সিংহের মতো গর্জন শোনা গেল রামগতিবাবুর।

ভজু তিন পা পেছিয়ে গেল। আর একবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পায়ের ধুলো জিভে ঠেকাবার মতলব বোধহয় তার ছিল, কিন্তু সাহস পেলো না। গুটি গুটি এগিয়ে গেল গেটের দিকে।

—আর জেনে যাও—তারপুন নয় হারপুন।

—হ্যাঁ—তারপুন নয় হারপুন, হারপুন—ভজনলাল অদৃশ্য হল।

—বিকেলটাই বরবাদ করে দিয়ে গেল—হতচ্ছাড়া। রামগতিবাবু স্বগতোক্তি করলেন: চা আর ওমলেটের পয়সাটা আদায় করে নিতে পারলে ঠিক হত। ভক্ত না ঘোড়ার ডিম—হুঁঃ!

রাত প্রায় দশটার কাছাকাছি। গিন্নি স্টোভে মাংস রান্না করছেন, পাশের ঘর থেকে তার মনোরম গন্ধ আসছে। সেই গন্ধে রামগতিবাবুর ভাব এসে গেল। চাদর দিয়ে বেশ করে কানটান ঢেকে নিয়ে তিনি কবিতা লিখতে বসলেন:

ঝম ঝম করছে রাত আর ঝিমঝিম করছে তারা,
বাইরে নেড়ী কুকুর শেয়ালকে লাগাচ্ছে তাড়া।
এই রাতে সাহারা মরুভূমিতে নেমেছে ধূসর হিম,
আর তিনজন বেদুয়িন হুঁকো টানতে টানতে খুঁজছে
কয়েকটি উটপাখির ডিম—

বেশ জমাট করে এই পর্যন্ত লিখেছেন, হঠাৎ ভাবটা কড়াৎ করে ঘুড়ির মতো কেটে গেল। বাইরে কে যেন খটাং খটাং করে কড়া নাড়ল।

আঃ, এই রাতে—এমন শীতের ভেতর কে জ্বালাতে এলো? সেই ভজনলালটা নয় তো? রামগতিবাবু ভুরু কোঁচকালেন।

আবার খট-খট-খটাং—

বিকট রকম দাঁত খিঁচিয়ে রামগতিবাবু দরজা খুলে দিলেন। ভজু এলে এবারে তাকে ঘাড়ধাক্কা দেবেন—নির্ঘাৎ।

কিন্তু ভজু নয়। মাথায় চকচকে টাক, কান পর্যন্ত তুলে দেওয়া মোটা পাকা মিলিটারী গোঁফ, গায়ে ওভারকোট, হাতে চুরুট, বদমেজাজী চেহারার এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

ভদ্রলোক ভরাট গম্ভীর গলায় বললেন, ইভ্‌নিং। একটু বেশি রাতে ডিসটার্ব করলুম বলে কিছু মনে করবেন না।—রামগতিবাবুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে তিনি বললেন, আপনারই নাম রামগতি সমাজপতি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে তো—

—আমি জে. কে. ঘোষ, কর্নেল ঘোষ বলে লোকে আমাকে জানে। মিলিটারীতে ছিলুম থার্টি ইয়ার্স। এখন রিটায়ার্ড।

—ওঃ, আসুন—আসুন! নমস্কার। ভেতরে আসুন।

ঘরে ঢুকে ভদ্রলোক ধপাৎ করে একখানা চেয়ারে দেহরক্ষা করলেন। চেয়ারটা মটমটিয়ে উঠল। মোটা চুরুটটা থেকে একরাশ বিচ্ছিরি ধোঁয়া রামগতিবাবুর মুখের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে কর্নেল ঘোষ গাঁ-গাঁ করে বললেন, ক্লাবে শুনে এলুম আপনি নাকি খুব বড় শিকারী। হাতী-গণ্ডার-সিংহ এই সব শিকার করে থাকেন। আমিও আফ্রিকায় ছিলুম, কেনিয়ায়—কঙ্গোতে। শিকারী হিসেবে জে. কে. ঘোষের কিছু নামও ছিল। তাই ভাবলুম যিনি রাশি রাশি হাতী-গণ্ডার শিকার করে থাকেন, সেই বীরপুরুষকে একবার দেখে আসা দরকার।

রামগতিবাবু হাঁ করে রইলেন কিছুক্ষণ।

—কিন্তু আমি তো হাতী-গণ্ডার—

কর্নেল ঘোষ মিলিটারী গোঁফে তা দিয়ে বললেন,—শিকার করেননি—করতে পারেন না। এই গোলগাল নন্দদুলাল চেহারা—ভুঁড়ি ভর্তি চর্বি—আপনি করবেন শিকার! ছোঃ! শিকারীর চেহারা কখনো এরকম হয় না।

রামগতিবাবু বিব্রত হয়ে বললেন, কি জ্বালা? আপনাকে কে বলেছে আমি শিকার—

—শাট্ আপ্!—কর্নেল ঘোষ চোখ পাকিয়ে বললেন, চালিয়াতির আর জায়গা পাননি! আমি কর্নেল জে. কে. ঘোষ—আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছেন! জীবনে কোনদিন রাইফেল ধরেছেন আপনি? ধরতে জানেন? আই ডোণ্ট বিলিভ্ ইট! দেখি আপনার হাত—

রামগতিবাবু হাঁ-হাঁ করে উঠতে গিয়ে হাহাকার করে উঠলেন। ততক্ষণ কর্নেল ঘোষ তাঁর ডান হাত পাঞ্জায় ধরে একটি চাপ দিয়েছেন আর হাতের আঙুলগুলো এক সঙ্গে মট্ মট্ করে উঠেছে।

—ছাড়ুন—ছাড়ুন—মরে গেলুম—উহুহু—ই-হি-হি—

—হুঁ, মারাই যাবেন এরপর। শিকারী আঙুল! ছোঃ—একতাল কাদা! আপনাদের মতো বাজে লোকদের জন্যে খাঁটি শিকারীদের বদনাম। ফের যদি এ-সব গুলবাজী করেন তাহলে এরপর এসে দুটো হাতই ভেঙে দিয়ে যাব। রাবিশ!

কর্নেল ঘোষ উঠে দাঁড়ালেন। ধাক্কা দিয়ে চেয়ারটা ফেলে দিয়ে ধড়াস করে দরজাটা আছড়ে বেরিয়ে গেলেন।

ততক্ষণ মাংস রান্না ফেলে গিন্নী ছুটে এসেছেন।

—কি হলো গো? এত গণ্ডগোল কিসের?

—একটা খুনে লোক এসে বোধহয় আঙুলগুলো ভেঙেই দিয়ে গেল গিন্নী। উহুহু—

গিন্নী চেঁচিয়ে উঠলেন: ওমা গো—কী হবে গো! থানা-পুলিস-খুন—

—দুত্তোর থানা পুলিস!—রামগতিবাবু বিকট মুখ ভ্যাংচালেন: থানা পুলিশ কী করবে মিলিটারীর কাছে। ই-হি-হি—এই শীতের ব্যথা! তুমি শিগ্‌গির এক প্যান গরম জল করে আনো—শিগ্‌গির—

সকালে উঠে গোঁজ হয়ে রামগতিবাবু ভাবতে লাগলেন, এ সব ভজার জন্যে। সে-ই যা-তা রটিয়েছে তাঁর নামে। রাত দুটো পর্যন্ত সেঁক দিয়ে এখন আঙুলের ব্যথাটা কমেছে বটে, কিন্তু মনের ভেতরে আগুন জ্বলছে সমানে। ভজাকে একবার সামনে পেলে—

কিন্তু সামনে যখন পাওয়া যাচ্ছে না—তখন মন খারাপ করে বসে থেকে আর কী হবে। আর সেই কালান্তক কর্নেল ঘোষকে—না—সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে কোথাও পেতে চান না তিনি। পাওয়ার কোনো দরকার বোধ করছেন না রামগতিবাবু।

দূরে সকালের পাহাড়ী নদীটা ঝিলমিল করছিল। আরো খানিকক্ষণ ব্যাজার হয়ে বসে থেকে ভাবলেন নদীর ধার থেকে একটু বেড়িয়ে আসবেন। কালকে সেই উটের ডিম নিয়ে কবিতাটা বেশ জমাট হয়ে উঠেছিল, সেটার বারোটা বেজে গেছে। ভাবলেন নদীর ধার থেকে একটু মুড্ নিয়ে আসবেন।

নিরিবিলি পাহাড়ী পথের ধার বেয়ে চলেছেন। দু'ধারে সাদা সাদা পাহাড়ী ফুলে গাছগুলো ছেয়ে আছে, পাখি-টাখি ডাকছে—রামগতিবাবুর গলায় খুস্‌খুস্ করতে লাগল। সবে গুনগুন করে গানের একটা কলি ধরেছেন এমন সময় কে যেন বললে,—এই যে!

ভজনলাল নাকি? দারুণ চমকে উঠে দেখলেন, ভজনলাল নয়। রোগা লম্বা চেহারার এক ভদ্রলোক, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, হাতে ছড়ি।

ভদ্রলোক আবার বললেন, এই যে আপনিই বোধহয় রামগতিবাবু?

সন্দিগ্ধ হয়ে রামগতি থেমে দাঁড়ালেন।

—হ্যাঁ। কি বলতে চান বলুন।

—আমি এখানকার স্কুলের হেডমাস্টার। জুলজীতে এম্-এস্সি। আমি আপনাকে একটা কথা জানাতে চাই। আপনারা ছাইপাঁশ নভেল লেখেন—কিন্তু লেখাপড়ার ধার দিয়েও যান না কোনদিন। আপনাকে কে বলেছে তুরপুন বিঁধিয়ে হাঙর শিকার করা যায়?

রামগতিবাবুর মাথার ভেতর ধাঁ করে জ্বলে উঠল। আবার সেই ভক্ত! ভক্তই তাকে পাগল করে দেবে। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে রামগতিবাবু বললেন, আমি কখনো এসব কথা বলিনি।

আলবাৎ বলেছেন! শহরশুদ্ধ লোককে বলে বেড়িয়েছেন। এই সব যা-তা লিখেই ছেলেপুলের মাথা খান—তারা গোল্লায় যায়।—হেডমাস্টার বেতের লাঠিটা ঠুকলেন রাস্তার ওপর: হাঙর সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া আছে আপনার? কোনদিন দেখেছেন হাঙর?

—আগে দেখিনি। এখানে এসে দেখছি। চারিদিকেই দেখতে পাচ্ছি তাদের। আপনারা সবাই হচ্ছেন এক-একটা নাদাপেটা ভেটকী মুখো হাঙর।—রামগতিবাবু জবাব দিলেন।

হেডমাস্টার বললেন, ইম্পসিবল। মানুষ কখনো হাঙর হয় না। হাঙরের নাদা পেট হতেই পারে না। হাঙর ভেটকীমুখো হয় না—হয় গ্রপার। গ্রপারকে অবশ্য নাদাপেটা ভেটকীমুখো বলা যেতে পারে। আপনি মাছ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

—জানি না তো বয়েই গেল—বলে হন হন করে রামগতিবাবু এগিয়ে গেলেন। পেছন থেকে হেডমাস্টার চিৎকার করে বললেন, আপনি আমার ছাত্র হলে টেস্টে কিছুতেই আলাউ করতুম না।

কোনদিকে না তাকিয়ে রামগতিবাবু এবার সোজা নদীর ধারে চলে এলেন। খাসা জায়গাটি। পাথরের ওপর দিয়ে ফেনা তুলে নীল জল নেচে চলেছে। দিব্যি হাওয়া দিচ্ছে—ঝিরঝির করছে পাহাড়ী ঝাউয়ের পাতা। কিন্তু মনে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছেন না। এমন মনোমত জায়গা—বসে বসে নিশ্চিন্তে দু'খানা উপন্যাস আর দশ ডজন কবিতা লেখা যেত, কিন্তু ভক্তর জ্বালাতেই তাঁকে এখান থেকে পালাতে হবে মনে হচ্ছে। যা নয় তা রটিয়ে বেড়াচ্ছে—লোকে বোধ হয় পাগল বলছে তাঁকে। এরকম মারাত্মক ভক্তও লোকের জোটে—ওঃ!

তবুও নদীর ধারে বসে থেকে মনটা খানিক শান্ত হল। তারপর এদিক

ওদিক ঘুরে, বস্তি থেকে সস্তায় একজোড়া মুরগী কিনে যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন বলতে কি, বেশ ভালোই লাগছিল রামগতিবাবুর।

কিন্তু ভালো লাগাটা বেশীক্ষণ রইল না। এক পেয়ালা চা খেয়ে কালকের কবিতাটা নিয়ে কেবল বসেছেন, আর লিখেছেন:

সেই সব ডিম যা স্বপ্ন দেখছিল বালির তলায়
ভাবছিল কবে ঘোড়া হয়ে উড়ে যাবে দিগন্ত সীমায়—

ঠিক তক্ষুনি কে ডাকল: রামগতিবাবু!

নিশ্চয় ভজু! খাতা রেখে তেড়ে বেরিয়ে গেলেন রামগতিবাবু কিন্তু এবারেও—এবারেও ভজনলাল নয়।

—আমি থানা থেকে আসছি।

বলবার দরকার ছিল না, চেহারা দেখেই সেটা মালুম হচ্ছিল রামগতির।

—আমার—আমার কাছে কী দরকার?

—আপনি আজ সকালে সাংচু নদীর ধারে গিয়েছিলেন?

রামগতি ঢোক গিললেন।

—তা গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে যাওয়াতে যে কোনো দোষ—

—থামুন। সেখানে আপনি কুরপুন না তুরপন দিয়ে মাছ মেরেছেন কেন? —থানার লোকটির স্বর এবার গুরুগম্ভীর।

—মাছ মেরেছি?—রামগতি আকাশ থেকে পড়লেন।

—হ্যাঁ, মেরেছেন। কী বলে—কী একটা কারপুন না চারপুন দিয়ে আপনি সব জায়গায় মাছ মেরে বেড়ান—এ কথা সবাই জানে। কেন মেরেছেন মাছ? জানেন, ওটা ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের আণ্ডারে? জানেন, বিনা পারমিশনে ওখানে মাছ মারলে ফাইন হয়?

রামগতিবাবু হাহাকার করে উঠলেন: কখনো না—আমি মাছ মারিনি। বস্তি থেকে দুটো মুরগী কিনেছি কেবল। বিশ্বাস না হয়—

লোকটি বললে—হুম্। বিশ্বাসটা কাল কোর্টে গিয়ে করাবেন। বেলা ঠিক সাড়ে দশটায়। এই নিন সমন। মাছ না মুরগী কালকেই বোঝা যাবে সেটা।

সমন তো সমন! সেইটে হাতে করে দাঁড়িয়ে রইলেন রামগতিবাবু। একেবারে নিটোল একটি উটপাখীর ডিমের মতোই।

পঁচিশ টাকা ফাইন হয়ে গেল।

আর ফাইন দিয়ে বাসায় ফিরলেন রামগতিবাবু। তক্ষুনি কুলি ডাকলেন, বিছানা বাঁধলেন, তারপর গিন্নীর গালাগাল শুনতে শুনতে সোজা স্টেশনে। এখানে আর একদিনও তিনি থাকবেন না—এক মুহূর্তও নয়! দু'দিনেই এই; চারদিন পরে তো তাহলে ফাঁসি যেতে হবে!

ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে, ঠিক সেই সময় কোত্থেকে ভজু এসে হাজির। সেই ভজনলাল পতিতুণ্ডি। সেই শাল কাঁধে, সেই নাকের নীচে মাছি মার্কা গোঁফ, সেই গোঁফের তলায় বিগলিত হাসি।

—একি স্যার—চলে যাচ্ছেন? এত তাড়াতাড়ি?—ভজনলালের গলায় মর্মান্তিক ব্যথা: দু'দিন আপনাকে কাছে পেতে না পেতেই হারালুম!

রামগতিবাবুর গিন্নী ঘোমটার আড়াল থেকে গর্জাচ্ছিলেন: আ মর মুখপোড়া—লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার! কিন্তু রামগতি গর্জালেন না, হুঙ্কার ছাড়লেন না—কিছুই বললেন না। কেবল দার্শনিকের মতো বললেন, কপাল!

ট্রেনের বাঁশি বাজল।

ভজু ব্যস্ত হয়ে কাছে এগিয়ে এল।

—স্যার, আপনার কলকাতার ঠিকানাটা? কলকাতায় গেলে দেখা করব।

আরও শান্ত হয়ে গেলেন রামগতিবাবু: জানালা দিয়ে মাথাটা বাড়িয়ে দাও—বলছি।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে।

জানালায় মাথা গলিয়ে ভজু সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে: ঠিকানা—ঠিকানা?

—এই যে।

দু'দিনের বহুযত্নে সঞ্চয়, বহু আকাঙ্ক্ষার ফল, অনেকদিন মাসল কণ্ট্রোলের পরিণাম ভজুর গালের ওপর নামল। একটি—একটি মাত্র চড়। কিন্তু কি সে চড়! এক ডজন বোমা ফাটার আওয়াজকেও ছাপিয়ে উঠল তার আওয়াজ!

—ই—ই—ই—

ভজনলাল গালে হাত দিয়ে সোজা প্লাটফর্মের ওপর বসে পড়ল।

ট্রেন চলছে! ডিসট্যান্ট সিগন্যাল পেরিয়ে এল। আঙুলের ব্যথাটা আর নেই—পঁচিশটা টাকার ক্ষতিপূরণ চড়টাতে হয়ে গেছে বলেই মনে হল। আর এই দু'দিন ধরে, বুকের ভেতর, তারপুন—না তুরপুন—না হারতুন—না কারপুন কী একটা সেই যে সমানে বিঁধছিল, সেটারও কোনো চিহ্ন এখন খুঁজে পাচ্ছেন না রামগতিবাবু।

জগন্নাথের ঠ্যাঙা

দুখীরাম গরীব ভিখিরী।

বয়েস বেশি নয়, জোয়ানই বলা চলে তাকে। কিন্তু তার মা নেই, বাপ নেই, ভাই নেই, বোন নেই, এক কথায় বিশ্বসংসারে কেউ নেই। তাতেও দুখীরামের দুঃখ ছিল না, খেটে-খুটে, পেটের ভাতের যোগাড়টা সে করতে পারত। কিন্তু একটা পা আবার তার খোঁড়া। কাজেই ভিক্ষে ছাড়া তার আর গতিই নেই।

দুপুরের চড়া রোদ্দুরে পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় দুখীরাম ভিক্ষে করে ফিরছিল। দারুণ গরম—বাতাসে যেন আগুন ছুটছে। দুখীরাম আর চলতে পারল না, পথের ধারে মস্ত একটা অশথগাছ গোল করে ঠাণ্ডা ছায়া ছড়িয়েছে, হাতের লাঠিটা পাশে রেখে সেখানেই শুয়ে পড়ল সে।

ঘুম ভাঙল তার বিকেলে। উঠতে গিয়ে দেখল, লাঠিটা নেই। সে ঘুমুচ্ছে দেখে, কোনো দুষ্টু লোক মজা করবার জন্যে লাঠিটা নিয়ে কোথাও

ফেলে দিয়েছে। গরীব ভিখিরীর ভাঙা লাঠি চুরি করবে, এমন চোর অবশ্য বিশ্বসংসারে নেই।

কিন্তু লাঠি চুরিই যাক আর কেউ ফেলেই দিক, দুখীরামের অবস্থা সঙ্গীন। লাঠি ছাড়া দু' পা হাঁটাই তার পক্ষে মুশকিল। এখন সে ভিক্ষেয় বেরুবে কী করে আর কেমন করেই বা বাড়ীতে ফিরে যাবে? তার নিজের কুঁড়েঘরটাও যে এখান থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে!

একে তো সারাটা দিন ভিক্ষে-শিক্ষে করে বিশেষ কিছুই হয় নি, পেটে খিদের আগুন জ্বলছে, তার ভেতরে এই বিপদ। দুখীরাম আর সইতে পারল না। ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল সে।

তখন হঠাৎ একটা শব্দ শুনল সে: ঠপাস। মনে হল, তার পেছনেই ওপর থেকে কী একটা পড়ল।

চমকে তাকিয়ে দুখীরাম দেখলে, একখানা লাঠি। যে-সব লাঠি হাতে করে বাবুরা বেড়াতে বেরোয়, ঠিক সেই রকম দেখতে, তবু একেবারে সে রকমটি নয়। কালো কুচকুচে লাঠিটার রঙ, গোটা কয়েক গাঁট আছে তাতে; হাতলের গায়ে রঙীন কাচের ছোট-ছোট দুটো চোখ বসানো— হঠাৎ দেখলে মনে হয় চোখ দুটো মিট-মিট করে তাকাচ্ছে।

দুখীরাম ভারী আশ্চর্য হয়ে গেল।

এ কার লাঠি? কাছাকাছি লোকজন কেউই তো নেই। অশত্থগাছটা থেকেই ওটা পড়ল মনে হচ্ছে, কিন্তু অশত্থগাছে লাঠি গজায় এ-কথা কে কবে শুনেছে? কাকে অবশ্য গেরস্থ-বাড়ী থেকে মুখে করে এটা-ওটা নিয়ে আসে, কিন্তু এত বড়ো একটা লাঠি বয়ে আনতে গেলে একটা নয়, অন্ততঃ ডজন তিনেক কাক দরকার। এক হনুমান-বাঁদরের কীর্তি হতে পারে, কিন্তু এ-তল্লাটে তো ও-সব কিছুই নেই!

তবে এ লাঠি কার?

দুখীরাম কিছুক্ষণ দ্বিধা করল। তারপর ভাবল, যারই হোক—আমি তো এখন কুড়িয়ে নিই। একটা লাঠি আমার নেহাৎই দরকার, নইলে এক পা-ও আমি হাঁটতে পারছি না। পরে গাঁয়ের ভেতর জিজ্ঞেস করে মালিককে ওটা ফেরত দেব। কিছু বকশিশও মিলে যাবে নিশ্চয়।

দুখীরাম লাঠিটার দিকে হাত বাড়ালো, আর সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হল, সে হাত দিয়ে চেপে ধরবার আগেই লাঠিখানা তার মুঠোর মধ্যে

এসে ঢুকল। যেন ওটা জীবন্ত, সে কখন ওকে ডাকবে, তারই জন্তে অপেক্ষা করছিল।

দুখীরামের সারা শরীর শিউরে উঠল। কিন্তু আদৌ তার ভয় করল না। লাঠিটাকে হাতে নেওয়া মাত্র যেন সে কেমন জোর পেলো গায়ে, পেটে খিদে তেষ্টা সত্ত্বেও ভারী স্ফূর্তি হল তার মনে। দুখীরাম লাঠিটায় ভর দিয়ে উঠে পড়ল, চলতে লাগল গ্রামের দিকে।

খাসা লাঠি। যেমন হাল্‌কা তেমনি শক্ত। দুখীরামের ওটা নিয়ে চলতে এত আরাম লাগল যে, সে যে খোঁড়া, সে কথা বেমালুম ভুলেই গেল সে।

পথের ধারে প্রাণকেষ্ট হালদারের বাড়ী। লোকটা ভারী খারাপ। একটা বিতিকিচ্ছিরি খেঁকী কুকুর সে পোষে, আর রাস্তায় গরীব-দুঃখী দেখলেই তার দিকে কুকুরটাকে লেলিয়ে দেয়।

ব্যাপারটা জানত বলেই, ভয়ে ভয়ে দূর দিয়ে চলে যাচ্ছিল দুখীরাম। প্রাণকেষ্ট বাড়ীর সামনে একটা খাটিয়ায় বসে বিড়ি টানছিল, সে ঠিক দেখতে পেলো দুখীরামকে। শয়তানীর হাসিতে প্রাণকেষ্টর মুখ ভরে উঠল।

'খোক্কোস, লে—লে—ছো—ছো—'

খোক্কোস হল প্রাণকেষ্টর সেই বিট্‌কেল খেঁকী কুকুরটার নাম। সে মনিবের খাটিয়ার তলায় বসে কটাং কটাং করে এঁটুলি কামড়াচ্ছিল, শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তারপরেই—'ঘুঁ—উ—উ—খ্যা—খ্যা—খ্যা' বলে সোজা তাড়া করল দুখীরামকে।

দুখীরামের প্রাণ উড়ে গেল। খোঁড়া পা নিয়ে সে যে কোন্ দিকে পালাবে ঠিক করতে পারল না। খোক্কোস তার সামনে গিয়ে সমানে খ্যাঁক্-খ্যাক্ করতে লাগল আর দুখীরামের দুর্গতি দেখে খাটিয়ার ওপর কুটপাট হতে লাগল প্রাণকেষ্ট।

কিন্তু হাসি তার বেশিক্ষণ রইল না।

হঠাৎ ঝাঁ করে দুখীরামের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল লাঠিটা। তারপরেই ধপাং ধপাং! কুকুরের পিঠে সে লাঠির ঘা কতক পড়তেই 'কাঁই-কাঁই' করে খোক্কোস ল্যাজ গুটিয়ে ছুট লাগালো, বোধ হয় এক ছুটে মাইল তিনকে পেরিয়ে গেল সে।

এবার লাঠি গিয়ে নামল প্রাণকেষ্টর পিঠে। সে কি মার! 'বাপ্‌রে

—মা রে' করে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে প্রাণকেষ্টর দাঁত-কপাটি লেগে গেল। আর সেই মুহূর্তে যেন শূন্য থেকে শোনা গেল কার গম্ভীর গলা: এ হল জগন্নাথের ঠ্যাঙা। যে সব বদমাস লোক অকারণ পরকে কষ্ট দেয়, এ হল তাদেরই দাওয়াই।

আর প্রাণকেষ্টকে শায়েস্তা করা লাঠি সুড়ৎ করে ফিরে এল দুখীরামের হাতে।

দুখীরাম হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। কী যে ঘটল সে তার বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারল না। শুধু দেখতে পেলো ত্রিসীমানায় থেঁকীর কোনো চিহ্ন নেই আর প্রাণকেষ্ট তখনো 'বাপরে—মা-রে—গেলুম রে—' বলে ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাচ্চে।

দুখীরাম আবার এগিয়ে চলল।

এতক্ষণে বুঝতে পারল সে নিজে চলছে না, লাঠিটাই যেন তাকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যেদিকে সে যেতে চাইছিল, সেদিকে যেতে পারল না—তার বদলে লাঠি তাকে পাশের গ্রামের দিকে নিয়ে চলল। দুখীরাম কিছু ভাবতে পারছিল না, তার মনে হচ্ছিল, যেন স্বপ্নের ঘোরে সে পথ চলছে।

চলতে চলতে বেলা গড়িয়ে এল, মাঠের ওপারে সূর্য ডুবল, অন্ধকার নামল। দুখীরাম ভাবছিল অনেক আগেই তার কুঁড়েতে ফেরা উচিত ছিল, রাত হয়ে গেলে এতটা পথ সে হাঁটবে কী করে! কিন্তু নিজের ইচ্ছায় সে কিছুই করতে পারছে না—লাঠিটাই তাকে যেখানে খুশি নিয়ে যাচ্ছে।

পাশের গ্রাম মদনপুর, আর গ্রামে ঢুকতেই যার মস্ত বাড়ী, তার নাম বদন মণ্ডল। বদন মস্ত মহাজন। দারুণ বড়ো লোক, তার বাড়ীতে নাকি টাকা-পয়সায় ছাতা পড়ে। কিন্তু হলে কী হয়, তার মতো নিষ্ঠুর লোভী ভূ-ভারতে নেই। কী করে দেনার দায়ে গরীবের ভিটে-মাটিটুকু পর্যন্ত সে কিনে নিবে, এই তার রাতদিনের চিন্তা।

আজ বদনের বাড়ীতে দারুণ ভোজের আয়োজন, কী যেন একটা মামলায় সে জিতেছে, তাই বিরাট রকম খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করছে সে। বিস্তর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন জড়ো হয়েছে, পেট্রোম্যাকস জ্বলছে, মাছ-মাংস-পোলাওয়ের গন্ধে চারদিক ভরে উঠেছে। দুখীরামের পেটের খিদেটা সে-গন্ধে আবার চাড়া দিয়ে উঠল।

ভোজের আসরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো দুখীরাম। হাত পেতে করুণ গলায় বললে, 'বাবু, গরীবকে যদি দয়া করে দুটো খেতে দেন—'

চোক পাকিয়ে বদন মণ্ডল চেঁচিয়ে উঠল: 'আ:, এ অযাত্রাটা আবার এখন কোথা থেকে এল! এই, কে আছিস?'

'সারাদিন খেতে পাই নি বাবু—দয়া করুন বাবু—'

বদন মণ্ডল চাকরগুলোকে ধমকে বললে, 'চুপ করে দেখছিস কী সব? ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দে-না ভিখিরীটাকে। আপদগুলো হাড় জালিয়ে খেলে!

'মার-মার' করে ছুটে এল চাকরেরা। আর—

আর তক্ষুণি দুখীরামের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল লাঠিটা।

তারপরে কী যে হল কেউ জানে না! চারদিকে শুধু 'গেলুম রে' রব, দমাদম, ধপাধপ, ঝনাঝন আওয়াজ। যেন প্রলয়কাণ্ড চলতে লাগল। আলোগুলো ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো, বাসনপত্র তচনচ, খাবার-দাবার ধুলো-কাদায় মাখামাখি—অতিথি, ঠাকুর, বাড়ীর লোকজন—ঠ্যাঙানি খেয়ে কে যে কোন্ দিকে ছুটে পালালো বোঝাই গেল না।

সব চেয়ে বেশি লাঠি পড়ল বদন মণ্ডলের পিঠে—সেটা বলাই বাহুল্য। আর শূন্য থেকে মোটা গম্ভীর গলায় কে যেন বললে, 'যারা লোভী, যারা নিষ্ঠুর, গরীবকে যারা খেতে দেয় না, জগন্নাথের ঠ্যাঙা এই ভাবেই তাদের শায়েস্তা করে থাকে।'

এক বছর কেটে গেছে। দুখীরাম এখন বদন মণ্ডলের জামাই। তার হাতের ঠ্যাঙার গুণ দেখে মণ্ডল বুঝেছে, খোঁড়া আর গরীব হলে কী হয়, দুখীরাম আসলে একটি সাংঘাতিক লোক—তাকে দিয়ে অনেক কাজ হবে। তাই নিজের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দুখীরামকে ঘর-জামাই করে রেখে দিয়েছে।

রাজার হালে আছে দুখীরাম, মাংস-মাছ, দুধ-ঘী মিঠাই-মোণ্ডা খেয়ে হাতির মতো মোটা হচ্ছে। সে যে কোনো দিন রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াত, সে-কথা তার মনেও পড়ে না। তার চাল-চলনই আলাদা এখন।

সেদিন দুপুরে রুপোর থালায় ভাত খাচ্ছে দুখীরাম, পাতে তার মস্ত একটা রুইমাছের মুড়ো। শাশুড়ী পাখা হাতে তাকে বাতাস করছেন।

এমন সময় কী করে অন্দরের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল এক ভিখিরী-বউ, সঙ্গে তার হাড়-জিলজিলে তিন-চারটে ছেলেমেয়ে।

কঙ্কালসার হাত বাড়িয়ে ভিখিরী-বউ বললে, 'দুটি খেতে পাই মা ?'

চাকর-বাকর হৈ-চৈ করে উঠল : 'বেরো—বেরো—'

ভিখিরী-বউ কেঁদে কেঁদে বললে, 'আমি কিছু চাইনে মা—বাচ্চাগুলো খিদেয় মরে গেল, যদি—'

এবার বেজায় রেগে দুখীরাম বললে, 'কী জ্বালা, এ-সব ভিখিরীর জন্যে কি একমুঠো ভাতও শান্তিতে খাওয়া যাবে না ? করছিস কি সব—মেরে তাড়িয়ে দে না—'

দরজার কোণায় দাঁড়িয়েছিল দুখীরামের লাটিটা। হঠাৎ যেন হাওয়ায় উড়ে এল সেটা।

তারপরেই দমাদম্—ধপাধপ্—ঝনাঝন্। কোথায় গেল রুপোর থালা, কোথায় গেল মাছের মুড়ো—কোথায় বা উবে গেলেন শাশুড়ী। তিন ঘা ঠ্যাঙানি খেয়েই চিৎ হয়ে পড়ল দুখীরাম।

শূন্য থেকে আবার সেই মোটা গম্ভীর স্বর শোনা গেল : 'শিক্ষা পেয়েও যারা তা ভুলে যায়, জগন্নাথের ঠ্যাঙা এমনি ভাবেই তাদের তা মনে করিয়ে দেয়।'

জ্ঞান হয়ে দুখীরাম দেখলে, সে সেই অশথতলায় পড়ে আছে, গায়ে তার ভিখিরীর সেই ছেঁড়া পোশাক, পাশে তার সেই পুরোনো অষ্টাবক্র লাঠিটা।

একাদশীর রাঁচী যাত্রা

টেনিদা বললে, আমার একাদশী পিসেমশাই—

আমি বললুম, একাদশী পিসে! সে আবার কি রকম?

—কি রকম আর? হাড় কঞ্জুস। খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে বলে লোকে নাম করে না—একাদশী বলে। কালকে সন্ধ্যেবেলায় তিনি রাঁচী গেলেন।

বললুম, ভালোই করলেন। রাঁচী বেশ জায়গা। হুড্রু আছে, জোনা ফল্‌স আছে। আমরা একবার ওখান থেকে নেতার হাট—

বাধা দিয়ে টেনিদা বললে, তুই থাম না—কুরুবক কোথাকার। একটা কথা বলতে গেলেই বকবকানি শুরু করে দিবি। একাদশী পিসে ও-সব হুড্রু-জোনা-নেতার হাট কিচ্ছু দেখতে যান নি। তিনি গেছেন কাঁকেতে।

—কাঁকে?—আমি চমকে বললুম, সেখানে তো—

আমার পিঠে প্রকাণ্ড একটা থাবড়া বসিয়ে টেনিদা বললে, ইয়াহ্—এতক্ষণে বুঝেছিস। সেখানে পাগলা-গারদ। তোর নিজের জায়গা কিনা, তাই কাঁকে বলবার সঙ্গে সঙ্গেই খুশি হয়ে উঠলি!

আমি ব্যাজার মুখে বললুম, মোটেই না, কাঁকে কক্ষণো আমার নিজের জায়গা নয়। বরং বল্টুদা বলছিল, তুমি নাকি চিড়িয়াখানার গাব্বে হাউসে দিন কয়েক থাকার কথা ভাবছ।

—গাব্বে হাউস ?—খাঁড়ার মতো নাকটাকে আকাশে তুলে টেনিদা বললে, কে বলেছে ? বল্টু ? ওই নাট-বল্টুটা ?

—হুঁ। সে কাল আমায় আরো জিজ্ঞেস করছিল, কি রে প্যালা তোদের টেনিদার ল্যাজটা ক' ইঞ্চি গজালো ?

টেনিদা খানিক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর বললে, অলরাইট। ফুটবলের মাঠে একবার বল্টেকে পেলে আমি দেখিয়ে দেব।

আমি ভালোমানুষের মতো বললুম, সে তোমাদের ব্যাপার—তোমরা বুঝবে। কিন্তু একাদশী পিসের কথা কী বলছিলে ?

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, থাম—ফ্যাচ ফ্যাচ করিস নি। দিলে মেজাজ চটিয়ে—এখন বলছে একাদশী পিসের কথা বলো। বলব না—ভাগ !

কিন্তু টেনিদার মেজাজ কী করে ঠাণ্ডা করতে হয় সে তো জানি। তক্ষুণি মোড় থেকে এক ঠোঙা তেলে-ভেজা কিনে আনলুম। আর গরম গরম আলুর চপে কামড় দিয়েই টেনিদা একেবারে জল হয়ে গেল।

—প্যালা, ইউ আর এ গুড্ বয়।

আমি বললুম, হুঁ।

—এই জন্যেই আমি তোকে এত ভালবাসি।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

—হাবুল সেন আর ক্যাবলাটার কিচ্ছু হবে না।

আমি বললুম, হবেই না তো। এই গরমের ছুটিতে —আমাদের ফেলে—একটা গেল মামাবাড়ীতে আম খেতে, আর একটা মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে গেল শিলঙে। বিশ্বাসঘাতক !

টেনিদা বেগুনী চিবুতে চিবুতে বললে, বল—ট্রেটর। ওতে জোর বেশি হয়।

বললুম, মরুক গে' ওদের কথা ছাড়ো। কিন্তু তোমার সেই একাদশী পিসে—

—ইয়েস—একাদশী পিসে। টেনিদা বললে, তাঁর কথাই বলতে যাচ্ছিলুম তোকে। আমার ঠিক রিয়েল পিসে নন—মা-র যেন কী রকম খুড়তুতো দাদামশাইয়ের মাসতুতো ভাইয়ের মামাতো শ্বশুরের—

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, থাক, এতেই হবে। মানে তিনি তোমার পিসেমশাই—এই তো?

—হাঁ, পিসেমশাই। বাঁকুড়ায় উকিল। খুব পশার—বুঝলি? বাড়ী—গাড়ী, বিস্তর টাকা। এক ছেলে পাঞ্জাবে ইঞ্জিনিয়ার, আর এক ছেলে যেন কোথায় প্রফেসারী করে। মানে এত পয়সা-কড়ি যে এখন পিসে ইচ্ছা করলে সব ছেড়ে বসে বসে গড়গড়া টানতে পারেন। কিন্তু ওসবে একাদশী পিসের সুখ নেই। খালি টাকা টাকা—টাকা। কিন্তু তার একটা পয়সা খরচ করতে হলে তাঁর পাঁজরা ভেঙে যায়।

—কী করেন তা হলে টাকা দিয়ে?

—কেন, ব্যাঙ্কে জমান। একটা কানা কড়িও তোলেন না তা থেকে। বলেন—গুরুর আদেশ। গুরু নাকি বলে দিয়েছেন ব্যাঙ্কের জমানো টাকা কখনো তুলতে নেই, তাতে পাপ হয়।

—সত্যিই ওঁর গুরু আছে নাকি?

—ঘোড়ার ডিম, সব বানানো। ওঁদের কে এক কুলগুরু নাকি একবার কিছু প্রণামীর আশায় ওঁর বাড়ীতে এসেছিলেন—একাদশী পিসে মোটা একখানা আইনের বই নিয়ে তাঁকে এমন তাড়া লাগালেন যে গুরুদেব এক ছুটে বাঁকুড়ার বর্ডার পেরিয়ে একেবারে মানভূম—মানে পুরুলিয়া ডিসট্রিক্টে চলে গেলেন।

—ডেন্‌জারাস!

—ডেনজারাস বলে ডেনজারাস! বাড়ীতে লোকজন টেঁকে না—ঝি-চাকর আসে, কিন্তু মোটা মোটা চালের আধপেটা ভাত, আধপোড়া দু-একখানা রুটি, খোসাশুদ্ধ কড়াইয়ের দাল আর ডাঁটার চচ্চড়ি দিন তিনেক খেয়েই তারা বাপরে—মা-রে বলে ছুটে পালায়। যাওয়ার আগে যদি মাইনে চায়, একাদশী পিসে বলেন, 'মাইনে! চুক্তি ভঙ্গের দায়ে এক্ষুণি তোদের নামে এক নম্বর ঠুকে দেব।'

পিসেমশাইয়ের বাড়ীতে গরু আছে, দুধও হয়—কিন্তু দুধ পিসেমশাই কাউকে খেতে দেন না—বলেন, 'ও তো শিশুর খাদ্য।' দুধ তিনি বিক্রী করেন। ঘি? আরে রাখো—কোন ভদ্রলোকে ঘি খায়? এক সের তেলে তাঁর বাড়ীতে ছ' মাস রান্না হয়। মাংস?

পিসে বলেন, 'ছিঃ জীবহিংসা করতে নেই।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, পরের বাড়ীতে গিয়ে তিনি মাংস খান না?

—খাবেন না কেন? পেলেই খান। কিন্তু জীব-হিংসের পাপ তো অন্যের। পিসের কী দোষ?

—আর মাছ?

—হুঁ, মাছ একটু অবিশ্যি না হলে তাঁর খাওয়া হয় না। দু'টো ছোট ছোট সিঙ্গি মাছ আনলে তাঁর মাসখানেক চলে যায়।

—সে কি!

টেনিদা মিট মিট করে হাসল: বুঝতে পারছিস না? মাছ দুটোকে হাঁড়িতে জীইয়ে রাখা হয়। আর রোজ সকালে পিসেমশাই একখানা দাড়ি কামানোর ব্লেড দিয়ে সেই মাছেদের ল্যাজ থেকে—এই মনে কর—আধ ইঞ্চির কুড়ি ভাগের একভাগ কেটে নেন।

আমি একটা বিষম খেলুম: কত বললে?

—আধ ইঞ্চির কুড়ি ভাগের এক ভাগ।

—কাটতে পারে কেউ? ইম্‌পসিবল!

—তুই ইম্‌পসিবল বললেই হবে? যে লোক ও-ভাবে পয়সা জমাতে পারে সে সব পারে। এমন ভাবে কাটেন যে মাছ দুটো টেরও পায় না—পরদিন সে ল্যাজ আবার তাদের গজিয়ে যায়। আর সেই ল্যাজের কাটা টুকরোটা দিয়ে এক বাটি ঝোল রান্না করে খান একাদশী পিসে—বলেন, 'সিঙ্গি মাছের ঝোল খুব বলকারক!'

আমি বললুম, তাতে আর সন্দেহ কী! কিন্তু মাছ দু'টো মরে গেলে?

—বাড়ীতে বিরাট ভোজ। সবাই সেদিন ঝোলে আঁশটে গন্ধ পায়। তারপর সাতদিন আর মাছ আসে না। পিসে বলেন—এত মাছ খাওয়া হয়েছে এগুলো আগে হজম হোক!

—তা এখন পিসে হঠাৎ রাঁচী গেলেন কেন?

—আরে যেতে কি আর চেয়েছিলেন? তাঁকে যেতে হল। সেই কথাই বলি।

এখন হয়েছে কী জানিস? সারা জীবন ওই কড়াইয়ের দাল আর ডাঁটা চচ্চড়ি খেতে খেতে শেষকালে পিসিমা গেলেন দারুণ চটে। ওদিকে টাকায় শ্যাওলা জমে গেল, এদিকে আমরা না খেয়ে মরি! বিদ্রোহ করলেন পিসিমা।

—বিদ্রোহ!

—তা ছাড়া আর কি! সামনা-সামনি কিচ্ছু বললেন না, কিন্তু চমৎকার প্ল্যান আঁটলেন একটা। পিসে তো কড়াইয়ের দাল, চচ্চড়ি আর তাঁর সেই খেয়ে নিয়মিত কোর্টে চলে যান। আর পিসিমা কী করেন? তক্ষুণি চাকরকে বাজারে পাঠান—গলদা চিংড়ি, ইলিশ মাছ, পাকা পোনা, ভাল মাংস, ডিম এইসব আনান। সেগুলো তখন রান্না হয়, পিসিমা খান, ঝি চাকর খায়—বাড়ীতে যে দুটো মড়াখেকো বেড়াল ছিল তারা দেখতে দেখতে তেল-তাগড়া হয়ে যায়।

আমি বললুম, এ কিন্তু পিসিমার অন্যায়? পিসেকে ফাঁকি দিয়ে—

টেনিদা রেগে বললে, কিসের অন্যায়? পিসে যদি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করেও না খেয়ে শিঁটকে হয়ে থাকেন—সে তাঁর খুশি। তাই বলে পিসিমা কষ্ট পেতে যাবেন কেন? আর অনেক দিনই ডাঁটা-চচ্চড়ি চিবিয়েছেন চিবুতে চিবুতে দাঁতই পড়ে গেছে গোটাকয়েক, শেষ বয়সে ইচ্ছে হবে না একটু ভালমন্দ খাবার?

—তা বটে।

—এই ভাবেই বেশ চলে যাচ্ছিল। পিসেমশাই কিছুই টের পেতেন না। কেবল মধ্যে মধ্যে বেড়াল দুটোর দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে একটা কুটিল সন্দেহ দেখা দিত। পিসিমাকে জিজ্ঞেস করতেন, 'বেড়াল দুটো কী খাচ্ছে-টাচ্ছে বলো তো? এত মোটা হচ্ছে কেন?' পিসিমা ভাল মানুষের মতো মুখ করে বলতেন, 'ওরা আজকাল খুব ইঁদুর মারছে—তাই।' 'ওঃ—ইঁদুর মারছে!' শুনে পিসিমশাই খুব খুশি হতেন, বলতেন, 'ইঁদুর মারা খুব ভালো ও ব্যাটারা ধান-চাল, কলাই টলাই খেয়ে ভারী লোকসান করে।'

সবই তো ভালো চলছিল, কিন্তু সেদিন হঠাৎ—

আমি জিজ্ঞেস করলুম, হঠাৎ?

—পিসেমশাই কোর্টে গিয়ে দেখলেন—কে মারা গেছেন, কোর্ট বন্ধ। একটু গল্প-গুজব করে, পরের পয়সায় দু-একটা পান-টান খেয়ে বেলা বারোটা নাগাদ হঠাৎ বাড়ী ফিরলেন তিনি। ফিরেই তিনি স্তম্ভিত! একী! সারা বাড়ী যে মাছের কালিয়ার গন্ধে ম-ম করছে। মাছের মুড়ো দিয়ে সোনামুগের দালের সুবাসে বাতাস ভরে গেছে যে! এ তিনি কোথায় এলেন—কার বাড়ীতে এলেন! জেগে আছেন, না স্বপ্ন দেখছেন!

দরজায় গাড়ী থামার শব্দে ওদিকে তো পিসিমার হাত পা পেটের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু পিসিমা দারুণ চালাক আর মাথাও খুব ঠাণ্ডা। তিনি এক গাল হেসে বললেন, 'এসো। এসো। তুমি যাওয়ার পরেই তোমার এক মক্কেল—কী নাম ভুলে গেছি—প্রকাণ্ড একটা রুই মাছ ভালো সোনামুগের দাল আর ফুলকপি পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই রান্না করছিলুম।'

'অ—মক্কেল।'—পিসেমশাই একটু আশ্বস্ত হলেন কিন্তু তারপরেই আঁতকে উঠে বললেন, 'কিন্তু তেল, ঘি? মশলা-পাতি?'

'সব সে পাঠিয়ে দিয়েছিল।'

'তাই নাকি? তাই নাকি? তাহলে খুব ভাল'—পিসেমশাইয়ের বোঁচা গোঁফের ফাঁকে একটু হাসি দেখা দিল: 'আমি ভাবতুম, মক্কেলগুলো সব বে আক্কেলে—এর দেখছি একটু বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। তা কোথাকার মক্কেল বললে? কী নাম?'

'নাম তো ভুলে গেছি।'—পিসিমা বুদ্ধি খাটিয়ে বললেন, 'বোধহয় সোনামুখীর কোন লোক।' তিনি জানতেন সোনামুখীতে পিসের কিছু মক্কেল আছে।

'সোনামুখী?'—ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন পিসে।

পিসি বললেন, 'হয়েছে—হয়েছে, এখন তোমায় আর অত আকাশ-পাতাল ভাবতে হবে না। কত লোকের মামলা জিতিয়ে দিয়েছ, কে খুশি হয়ে দিয়ে গেছে, ও নিয়ে মাথা ঘামালে চলে? এখন এসো—মুড়ি ঘণ্টের দাল আর মাছের কালিয়া দিয়ে দুটো ভাত খাও।'

বাড়ী গন্ধে ভরাট—তাতে মাথা খারাপ হয়ে যায়—পিসেমশাইয়ের পেটও চুঁই চুঁই করছিল; তবু একটু মাথাটা চুলকে বললেন, 'বামুনের ছেলে, এক সূর্যিতে দু'বার ভাত খাবো?'

'ভাত না খেলে। মাছই খাও একটু।'

'তা হলে ভাতও দাও দুটো। শুধু মাছে কি আর—'পিসে ভেবে-টেবে বললেন, 'আর মক্কেলই তো খাওয়াচ্ছে—ওতে দোষ হবে না বোধ হয়।'

পিসিমা বললেন, 'না—কোন দোষ হবে না।'

অগত্যা পিসে বসে গেলেন। কিন্তু ডাল থেকে মুড়ো তুলে মুখে দিয়েই—হঠাৎ একটা আর্তনাদ করলেন তিনি।

'এ যে যজ্ঞির রান্না।'

পিসিমা বললেন, 'পরের পয়সায় তো।'

'কিন্তু কয়লা পুড়ল যে!'

পিসিমা বললেন, 'কয়লা তো পোড়াইনি। চাকর দিয়ে শুকনো ডাল-পালা কুড়িয়ে আনিয়েছি।'

'কিন্তু—কিন্তু—হাঁড়ি-ডেক্‌চিগুলো?'—বুকফাটা চিৎকার করলেন পিসেমশাই।

'সেগুলো আগুনে পুড়ল না এতক্ষণ? ক্ষতি হল না তাতে? তারপর মাজতে হবে না? আরো ক্ষয়ে যাবে না সে জন্যে?'—বলতে বলতে পিসেমশাই ডুকরে কেঁদে কেঁদে উঠলেন: গেল—আমার এত টাকার হাঁড়ি-ডেক্‌চি ক্ষয়ে গেল—'আর কাঁদতে কাঁদতে ঠাস করে পড়ে গেলেন। পড়েই অজ্ঞান।

জ্ঞান হলো বারো ঘণ্টা পরে। চোখ লাল—খালি ভুল বকছেন। থেকে থেকে কঁকিয়ে কেঁদে উঠছেন: 'গেল—গেল—আমার হাঁড়ি-ডেক্‌চি গেল!'

ডাক্তার এসে বললেন, 'দারুণ শক পেয়ে পাগল হয়ে গেছে। রাঁচী পাঠিয়ে দেখুন—ওরা যদি কিছু করতে পারে।'

তাই একাদশী পিসে কাঁকে চলে গেলেন। হয় তো ছ' মাস পরে ফিরবেন। এক বছর পরেও ফিরতে পারেন। আর নইলে পাকাপাকি ভাবে থেকেও যেতে পারেন ওখানে। রাঁচীর জল হাওয়ায় ভালোই থাকবেন আর মধ্যে মধ্যে হাঁড়ি-ডেকচির জন্যে কান্নাকাটি করবেন।

আমি বললুম, আচ্ছা টেনিদা, এখন একাদশী পিসি কী করবেন? বেশ নিশ্চিন্তে রোজ রোজ মাছ-মাংস-পোলাও-পায়েস খাবেন তো?

টেনিদা বললে, ছি প্যালা – তুই ভীষণ হার্টলেস!

আমি চুপ করে রইলুম। তেলে ভাজার ঠোঙা শেষ হয়ে গিয়েছিল, একটা ল্যাজ নাড়া নেড়ী কুত্তার গায়ে সেটা ছুড়ে দিয়ে টেনিদা আমার কানে কানে বললে, এখন মানে যদ্দিন পিসে কাঁকেতে থাকে—এই সময় বাঁকুড়ায় বেড়াতে যাওয়া যায়, না রে? যাবি তুই আমার সঙ্গে?

পরমানন্দে মাথা নেড়ে আমি বললুম, নিশ্চয়—নিশ্চয়।

আলু-কাবলি

সকাল বেলায় বেড়াতে বেরিয়ে প্রোফেসার গড়গড়ি দেখতে পেলেন, সামনের ছোট মাঠটার ভেতরে দুটি ছেলে মারামারি করছে।

দু' জনকেই স্কুলের ছাত্র বলে মনে হল। চৌদ্দ-পনেরো বছরের মতো বয়েস হবে। একটি বেশ গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান, আর একটি রোগা পটকা। এসব ক্ষেত্রে যা হয়, রোগা ছেলেটিই মার খাচ্ছিল, জোয়ানটি তাকে ইচ্ছামতন পিটিয়ে যাচ্ছিল।

আর কেউ হলে মাঝে পড়ে থামিয়ে দিত, কিন্তু প্রোফেসার গড়গড়ি তা করলেন না। অনেকদিন তিনি বিলেতে ছিলেন। সে দেশের পথে-ঘাটেও ছেলেদের তিনি মারামারি করতে দেখেছেন। আর এও দেখেছেন—ওপর-পড়া হয়ে আগে থেকেই কেউ থামিয়ে দেয় না—একজন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেলে, জয়-পরাজয়ের একটা মীমাংসা হলে, তখনই তারা ছাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'এখন সব মিটে গেছে, এবার বন্ধুর মতো হ্যাণ্ডশেক করে বাড়ি চলে যাও।'

সুতরাং প্রোফেসার গড়গড়ি মোটা ছড়িটা হাতে নিয়ে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে, মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। রোগা ছেলেটি এখনো হার মানে নি, প্রচুর মার খেয়েও সমানে হাত চালিয়ে যাচ্ছে, অতএব এখনো তাঁর কিছু করবার নেই। সময় হলে তবেই তিনি আসরে নামবেন।

নতুন বাড়ি করে এই পাড়ায় তিনি এসেছেন মাত্র দিন তিনেক হল। প্রতিবেশীদের সঙ্গে বলতে গেলে আলাপই হয়নি, আর পাড়ার ছেলেরা তো তাঁকে চেনেই না। যদি চিনত তা হলে জানতে পারত এই লম্বা রোগা মাঝবয়েসী লোকটির শরীর একেবারে ইস্পাতে গড়া। দু' হাতে তিনি সিংহের শক্তি ধরেন; জানতে পারত সোজা খাড়া শরীরটার মতই তাঁর মনের

মধ্যেও কোনো ঘোর-প্যাঁচ নেই। প্রোফেসার গড়গড়ি ন্যায়-বিচার পছন্দ করেন আর সে কাজটা চটপট সেরে ফেলাই তাঁর অভ্যাস।

তার ন্যায় বিচারের একটা নমুনা দিই। প্রোফেসার গড়গড়ি মোটামুটি অবস্থাপন্ন লোক, কিন্তু বাজে খরচ ভালোবাসেন না, মোটা চালে চলেন, ট্রেনে থার্ড ক্লাসে ওঠেন। সেবার কোন্ একটা স্টেশন থেকে রাত আটটা নাগাদ গাড়ীতে উঠেছেন। ট্রেনে খুব একটা ভিড় ছিল তা নয়, সবাই-ই বসে যেতে পারে, তবু কয়েকজনকে দাঁড়িয়ে যেতে হচ্ছে। কারণটা আর কিছুই নয়—একটি দশাসই চেহারার লোক একখানা গোটা বেঞ্চি জুড়ে পরম আরামে লম্বা হয়ে রয়েছে।

রাত আটটার সময় একজন বয়স্ক লোকের কিছুতেই এভাবে শুয়ে পড়া উচিত নয়—একথা প্রোফেসার গড়গড়ির মনে হল। মনে আরো অনেকেরই হয়েছিল, কিন্তু লোকটির ভীমের মত চেহারা আর প্রকাণ্ড গোঁফজোড়া দেখে কেউ আর তাকে ঘাঁটাতে সাহস করেনি—নির্বিবাদেই চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। প্রোফেসার গড়গড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে রাজী হলেন না। লোকটাকে একটু ধাক্কা দিয়ে ডাকলেন : 'এ জী!'

লোকটা চোখ পাকিয়ে তাকালো। বললে, 'কেয়া?'

প্রোফেসার গড়গড়ির হিন্দী ভালো আসে না। তবু যতটা পারেন সাজিয়ে গুজিয়ে, বেশ গরম গলায় বললেন, 'আপ কি চারঠো টিকিট কিয়া হ্যায়?'

লোকটি ভুরু কুঁচকে বললে, 'কেয়া মৎলব?'

'মৎলব এই হ্যায় কি, চারঠো টিকিট নেহি কিয়া তো চার আদ্‌মির জায়গা দখল কর্‌কে কেন শুয়ে পড়া হ্যায়? উঠিয়ে—হাম্‌লোগ ভি বৈঠেঙ্গে।'

লোকটি সংক্ষেপে বললে, 'তবিয়ৎ খারাপ হ্যায়।'

'তবিয়ৎ খারাপ? দেখকে তো সে রকম মনে নেহি হোতা হ্যায়। বেশ তাগড়াই চেহারাই তো মালুম হচ্ছে। কেয়া বিমার?'—বলেই প্রোফেসার গড়গড়ি তার গায়ে হাত দিলেন : শরীর তো বেশ ঠাণ্ডা—'বোখার-টোখার তো শুরু নেহি হুয়া।'

লোকটা যদি বলত যে পেটে ব্যথা-ট্যথা কিছু হচ্ছে, তা হলে—মনে মনে সন্দেহ থাকলেও প্রোফেসার গড়াগড়ি সেটা বিশ্বাস করতে রাজী হতেন। কিন্তু দশাসই লোকটা সেদিক দিয়েই গেল না। গড়গড়ির হাতটা গায়ের

ওপর থোক ছুঁড়ে দিয়ে বললে, 'যাঃ—ভাগ। হাম শুতে রহেঙ্গে—হামারা খুশি।'

'শুতে রহেঙ্গে? আপকা খুশি?' প্রোফেসার গড়গড়ি বললে, 'তা হলে প্ল্যাট্‌ফর্মে গিয়েই শুয়ে থাকা হোক, সেখানে অনেক জায়গা হায়।'

বলেই, আর এক সেকেণ্ডও দেরী না করে—লোকটিকে সোজা পাঁজাকোলা করে তুলে ফেললেন আর পত্রপাঠ তাকে প্ল্যাট্‌ফর্মে ছুড়ে ফেলে দিলেন—কম্বল-টম্বল সব শুদ্ধই একেবারে।

গাড়ীশুদ্ধ লোক থ! যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে বেঞ্চিতে বসে পড়ে প্রোফেসার গড়গড়ি ধীরে সুস্থে একটা চুরুট ধরালেন, অন্য যাত্রীদের ডাক দিয়ে বললেন, 'দাঁড়িয়ে কেন আপনারা? বসুন --জায়গা তো রয়েছে।'

আর লোকটি? প্ল্যাট্‌ফর্মে খানিকক্ষণ হাঁ করে বসে থেকে, গায়ের ধুলো ঝেড়ে, একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে—সেই যে কামরার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে রইল আর ভেতরমুখো হল না।

প্রোফেসার গড়গড়ি এইরকম ন্যায়পরায়ণ লোক। বাড়ির গোয়ালা নিয়মিত দুধে জল দিচ্ছিল—অল্প-অল্প ওরা দেয়ই, গড়গড়ি কিছু মাইণ্ড করেন নি। কিন্তু তাঁকে চুপচাপ দেখে গোয়ালার সাহস বেড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত দুধটা শুধু রইল রঙেই—বাকীটা শ্রেফ কর্পোরেশনের বিশুদ্ধ কলের জল!

তখন প্রোফেসার গড়গড়ি একদিন গোয়ালাকে ডেকে অনেক সদুপদেশ দিলেন। বললেন, 'অতি লোভ ভালো নয়, তার ফল ভবিষ্যতে খারাপ হয়।' গোয়ালা মন দিয়ে সব শুনে মাথা নেড়ে চলে গেল আর পরের দিনই জলের মাত্রা আরো একটু বাড়িয়ে দিলে।

অগত্যা প্রোফেসার গড়গড়িকে ন্যায়-বিচারের দায়িত্বটা নিতেই হল। তিনি একদিন গোয়ালাকে জাপটে ধরলেন, তারপর দারুণ শীতের সকালে বাড়ির চৌবাচ্চা থেকে পাক্কা তিন ঘটি কন্‌কনে জল গোয়ালাকে জোর করে গিলিয়ে দিয়ে বললেন, 'নিজেই ত্যাখো এবার, জল খেতে কেমন লাগে।'

গোয়ালা পালিয়ে গেল, পরদিন এল আর এক নতুন গোয়ালা। কিন্তু এর পর থেকে গড়গড়ি একেবারে নির্জলা খাঁটি দুধ পেতে লাগলেন।

এ-হেন ন্যায়-পরায়ণ লোক দুটি ছেলেকে মারামারি করতে দেখে চট

করে কিছু করে বসবেন, এমন হতেই পারে না। হাতের মোটা ওয়াকিং স্টিকটার ওপর ভর করে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি দেখতে লাগলেন, ব্যাপারটা কত দূর গড়ায়!

কতদূর আর গড়াবে! একটু পরেই জোয়ান ছেলেটা রোগা ছেলেটিকে চিৎ করে ফেলে তার বুকে চড়ে বসল। তারপর যখন ঘুং করে আরো মারতে যাচ্ছে, তখন গড়গড়ি একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বিজয়ীকে তুলে আনলেন। বললেন, 'ব্যাস, হয়ে গেছে। এইবার শেক্ হ্যাণ্ড্ করো— তারপর সোজা বাড়ি চলে যাও।'

মোটা ছেলেটা তো আর ইংরেজের বাচ্চা নয় যে এ-সব কথা সে বুঝবে! সে পাল্টা চোখ পাকিয়ে বল্‌লে, 'আপনি কে মোসাই ফর-ফর করতে এসেচেন? আমি ওর বদন বিগড়ে দেব? আলুকে ও এখনো চেনে না!'

ছেলেটির মেজাজ দেখে প্রোফেসার গড়গড়ি বেশ কৌতুহল বোধ করলেন।

'ওঃ, তোমার নাম বুঝি আলু? তুমি বুঝি খুব বিখ্যাত লোক?'

আলু চোখ বাঁকা করে এমন ভাবে তাকালো—যেন সম্রাট আলেকজাণ্ডারকে প্রশ্নটা করা হয়েছে।

'মোসাই বুঝি অন্য পাড়ার লোক?'

'ছিলুম আগে। এখন দিন তিনেক হল তোমাদের পাড়ার বাসিন্দে হয়েছি।'

'অ।'—আলু চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, 'তাই আমার নাম শোনেননি এখনো। শুনবেন শুনবেন, আস্তে আস্তে শুনবেন।'

'বেশি শোনবার দরকার নেই, এতেই বোধ হয় তোমাকে চিনতে পারছি। তা মারামারি করছিলে কেন এর সঙ্গে?'

'মারামারি! ফুঃ।' আলু যেন কথাটা ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলে: 'ওই ফড়িংটার সঙ্গে মারামারি করব? পিটছিলুম মোসায়, হাতের সুখ করে নিচ্ছিলুম। ফড়িংটার সাহস দেখুন—পাল্টা লড়ে যাচ্ছে আমার সঙ্গে! আপনি চলে যান মোসাই, আমি ওকে তুলোধোনা করে দিচ্ছি।'

গড়গড়ি চেয়ে দেখলেন রোগা ছেলেটির দিকে। ঘাসের ওপর বসে পড়ে সে হাঁপাচ্ছে। তার শার্ট ছেঁড়া, ঠোঁটের কোণে রক্ত। চোখে একটু জলও দেখা গেল যেন।

গড়গড়ি বললেন, 'তোমার নাম কি ?'

রোগা ছেলেটা গোঁজ হয়ে রইল, জবাব দিলে না। আলু বললে, 'ও ? ওর নাম কাবুল।'

তাই বুঝি আলু আর কাবুলে মিলে আলু-কাব্‌লি তৈরি হচ্ছিল ?'

'হেঃ—হেঃ—হেঃ!'—আলু হেসে উঠল ‌ 'মোসাই তো বেশ মজা করে কথা বলতে পারেন। তা স্যারের নামটা কি ?' বলে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালো। প্রোফেসার গড়গড়ি আড় চোখে একবার চেয়ে দেখলেন কেবল।

রোগা ছেলেটি—অর্থাৎ আলু কাবলির কাবুল তখন উঠে চলে যাওয়ার উপক্রম করছিল। প্রোফেসর গড়গড়ি মোটা গলায় বললেন, 'দাঁড়াও হে ছোকরা, দরকারী কথা আছে।' তাঁর গলার আওয়াজে এমন একটা কিছু ছিল যে ছেলেটা থমকে গেল, এমন কি বেপরোয়া আলুর পর্যন্ত হাতটা সিগারেট শুদ্ধ কেঁপে উঠল একবার।

আলু বললে 'বেশ জবরদস্ত গলাটিতো মোসাইয়ের। তা নামটা বললেন না ?'

'হবে এখন, নামের জন্যে ভাবনা কি !'—গড়গড়ি হাসলেন : 'আমাকেও আস্তে আস্তে চিনবে। তা ওকে তুমি মারছিলে কেন ?'

'মারব না ?'—আলু গড়গড়ির মুখের ওপরেই একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে দিলে : 'ও আমাকে গেরাজ্যি করে না।'

'করে না নাকি ?'

'একেবারে না। ক্লাসের ফার্স্ট বয় কিনা, অহঙ্কারে পা পড়ে না মাটিতে, আমি ফেল করি, টুক্‌লিফাই করি—এ সব বলে বেড়ায়।'

'করিসই তো ফেল, টুকলিই তো করিস্'—কাবুল কাঁদো কাঁদো গলায় বললে।

আলু প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল তার ওপর—গড়গড়ি মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'হচ্ছে, হচ্ছে, ঠ্যাঙানি তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না! কাবুল, ডোণ্ট ডিস্টার্ব—আলুকে বলতে দাও।'

আলু বললে, 'ও সবে আমি গ্রাহ্যি করি না মোসাই। আমার বাপের পয়সায় আমি ফেল করি, হাতের জোরে টুক্‌লি করি, ভয় পাই নাকি ? কথাটা কি জানেন, ও আমাকে একদম খাতির করে না।'

'তোমাকে খাতির করা দরকার বুঝি ?'

'দরকার নয় ? আমার গায়ে জোর আছে। পাড়ায় ছেলে-বুড়ো আমার নামে কাঁপে।'

'ও কাঁপে না ?'

'না। কাল সিনেমায় যাব বলে ওর কাছে একটা টাকা চেয়েছিলুম, দেয়নি। পরশু বলেছিলুম, চপ-কাটলেট খাওয়া—বলেছে গুণ্ডাকে আমি খাওয়াই না। টিংটিঙেটার আস্পর্দা দেখেছেন ?'—বলেই আবার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল।

গড়গড়ি বললেন, 'ঠিক।'

'ঠিক না ?'—আলু মুরুব্বিয়ানা চালে হাসল: 'মোসাই দেখছি বেশ সমঝদার লোক !'

গড়গড়ি এবার কটকট করে তাকালেন কাবুলের দিকে।

'ছাখো ছোকরা, ক্লাসের ফার্স্ট-বয় হলেই হয় না। গায়ে যদি জোর না থাকে, তা হলে জোয়ানদের কথা মানতে হবে, আর নইলে মার খেতে হবে। দুনিয়ায় এই নিয়ম।'

কাবুলের চোখ জলে উঠল: 'দুনিয়া বুঝি গুণ্ডাদের জন্যে ?'

'না, শক্তিমানের জন্যে।'—গড়গড়ির স্বর কঠোর হল: 'মন আর শরীর দুটোই শক্ত হওয়া দরকার। শুধু ফার্স্ট বয় হলেই চলে না। মাস্‌ল্‌ও জোরালো করতে হয়। হয় গুণ্ডার কাছে হার মানো নইলে গুণ্ডাকে ঠাণ্ডা করো—আর কোনো রাস্তা নাই। তোমাকে আলু পিটিয়েছে, বেশ করেছে। ইউ ডিজার্ভ ইট।'

কাবুল আবার বোঁ বোঁ করে চলে যাচ্ছিল, গড়গড়ি সেই ভয়ঙ্কর গলায় বললে, 'দাঁড়াও।'

কাবুল চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, এমন কি গলার আওয়াজটা আলুরও ভালো লাগল না। সিগারেটে আর একটা সুখের টান দিয়ে বললে, 'মোসায়ের গলাটি বেশ জোরালো। কিন্তু কথাটা বলেছেন বেড়ে। জোর যার মুল্লুক তার।'

গড়গড়ি বললেন, 'ঠিক।'

আলু উৎসাহ পেয়ে বললে, 'যার জোর আছে তাকে মানতে হয়। নইলে ঠ্যাঙানি খেতে হয়।'

গড়গড়ি বললেন, 'তা-ও ঠিক।'

'তা হলে মোসাই কথাটা বুঝিয়ে দিন ওদিকে। আজ আপনি এসেছেন বলে পার পেয়ে গেল, নইলে আমি ওকে—'

গড়গগড়ি বাধা দিয়ে বললেন, 'বলতে হবে না। কিন্তু তোমাকেও যে একটা কথা বোঝাবার আছে হে আলু!'

আলু খিক খিক করে হেসে বললে, 'আমাকে।'

'হাঁ, তোমাকে। আমি যদি বলি, আমার গায়ে তোমার চেয়ে বেশি জোর আছে—মানবে তো আমাকে?'

'কি বললেন?'

'ঠিক বলছি, আমার গায়ে বেশি জোর আছে, সুতরাং তুমি আমাকে মেনে চলবে। কাজেই আমার মতো বয়স্ক লোকের মুখের সামনে তুমি যে অসভ্যের মতো কথা বলছ, বাঁদরের মতো সিগারেট ধরিয়েছ, তার জন্যে এক্ষুনি তোমায় ক্ষমা চাইতে হবে।'

'ক্ষমা চাইব!'—আলু হা হা করে হেসে উঠল: 'হাতি ঘোড়া গেল তল, মোসা বলে কত জল! আপনার মতো কত মক্কেলকে আমি ইঁট মেরে—'

আর বলতে হল না। এইবার ন্যায় বিচারের সময় হয়েছে।

হাতের লাঠিটা ফেলে দিয়ে গড়গড়ি বললেন, 'আমার জোর পরখ করতে চাও বুঝি? বেশ-বেশ!'

তারপর দুম্ দুম্ শব্দে দুটি কিল পড়ল আলুর পিঠে। মাত্র দুটি। আলু তাতেই আলুর দম—একেবারে চোখ উল্‌টে বসে পড়ল ঘাসের ওপর —মনে হল সে গুঁড়ো হয়ে গেছে।

গল্পটা এখানে শেষ নয়।

আলু, অর্থাৎ আলোক চৌধুরী আজকাল প্রোফেসার গড়গড়ির সব চেয়ে ভক্ত শিষ্য। পাড়ার 'গুণ্ডাদমন সমিতির' সে ক্যাপ্টেন, লোকে বলে, খাসা ছেলে। এমন কি টুক্‌লি না করেই, সে ফার্স্ট ডিভিসনে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছে এবার।

আর কাবুল—মানে স্কলারশিপ পাওয়া জুয়েল ছাত্র কমল গুপ্ত, এখন তার প্রাণের বন্ধু। কমল গুপ্তের হাতে মাস্‌লও এখন দেখবার মতো—আলোক আর কমল পাঞ্জা লড়লে কে জিতবে, জোর করে বলা শক্ত।

টেনিদা আর ইয়েতি

ক্যাবলা বললে, 'ইয়েতি—ইয়েতি। সব বোগাস।'

চ্যা চ্যা করে চেঁচিয়ে উঠল হাবুল সেন।

'হ, তুই কইলেই বোগাস হইবো! হিমালয়ের একটা মঠে ইয়েতির চামড়া রাইখ্যা দিছে, জানস তুই?'

'ওটা কোনো বড় বানরের চামড়াও হতে পারে' চশমাসুদ্ধু নাকটাকে আরো ওপরে তুলে ক্যাবলা গম্ভীর গলায় জবাব দিলে

হাবুল বললে, 'অনেক সায়েবে তো ইয়েতির কথা লেখ্ছে।'

'কিন্তু কেউই চোখে দেখেনি। যেমন সবাই ভূতের গল্প বলে—অথচ নিজের চোখে ভূত দেখেছে—এমন একটা লোক খুঁজে বের কর দিকি?'

এইবারে আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলুম, এমন সময় টেনিদা এসে চাটুজ্জেদের রোয়াকে পৌঁছে গেল। একবার কটমট করে আমাদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে মোটা গলায় বললে, 'কী নিয়ে তোরা তক্কো করছিলি র‍্যা?'

আমি বললুম, 'ইয়েতি।'

'অ—ইয়েতি।'—টেনিদা জাঁকিয়ে বসে পড়ল: 'তা তোরা ছেলেমানুষ—ও সব তোরা কী জানিস? আমাকে জিজ্ঞেস কর।'

হাবুল বললে, 'ঈস—কী আমার একখান ঠাকুর্দা আসছেন রে!'

টেনিদা বললে, 'চোপরাও। গুরুজনকে অচ্ছেদ্দা করবি তো এক চড়ে তোর কান আমি—'

আমি 'ফিল আপ দি গ্যাপ' করে দিলুম: 'কানপুরে পৌঁছে দেব।'

'ইয়া—ইয়া—কারেক্ট্।'—বলে টেনিদা এমন জোরে আমার পিঠে থাবড়ে দিলে যে হাড়-পাঁজরাগুলো পর্যন্ত ঝনঝন করে উঠল। তারপর বললে, 'ইয়েতি? সেই যে কী বলে—অ্যাব্—অ্যাব্—অ্যাবো—'

ক্যাবলা বললে, 'অ্যাবোমিনেব্ল্ স্নোম্যান।'

'মরুক্ গে—ইংরিজিটা বড্ড বাজে—ইয়েতিই ভালো। তোরা বলছিস নেই? আমি নিজের চক্ষে ইয়েতি দেখেছি।'

'তুমি!'—আমি আঁতকে উঠলুম।

'অমন করে চমকালি কেন—শুনি?'—চোখ পাকিয়ে টেনিদা বললে, 'আমি ইয়েতি দেখব না তো তুই দেখবি? সেদিনও পটোল দিয়ে শিঙি মাছের ঝোল খেতিস, তোর আস্পর্ধা তো কম নয়!'

হাবুল বললে, 'না—না, প্যালা দেখবো ক্যান্? আমরা ভাব্‌তা ছিলাম—ইয়েতি তো দেখবো প্রেমেন মিত্তিরের ঘনাদা—তুমি এই সব ভ্যাজালে আবার গেলা কবে?'

ঘনাদার নাম শুনে টেনিদা কপালে হাত ঠেকালো: 'ঘনাদা! তিনি তো মহাপুরুষ। ইয়েতি কেন—তার দাদামশাইয়ের সঙ্গেও তিনি চা-বিস্কুট খেতে পারেন। তাই বলে আমি একটা ইয়েতি দেখতে পাব না, এ কথার মানে কী?'

ক্যাবলা বললে, 'তুমিও নিশ্চয় দেখতে পারো—তোমারও অসাধ্য কাজ নেই। কিন্তু কবে দেখলে, কোথায় দেখলে—'

'শুনতে চাস?'—কথা কেড়ে নিয়ে টেনিদা বললে, 'তা হলে সামনের ভুজাওলার দোকান থেকে ছ' আনার ঝালমুড়ি নিয়ায়—কুইক্!'—আর তৎক্ষণাৎ আমার পিঠে একটা বাঘাটে রদ্দা কষিয়ে বললে, 'নিয়ায় না—কুইক্!'

রদ্দা খেয়ে আমার পিত্তি চটে গেল। বললুম, 'আমার কাছে পয়সা নেই।'

'তা হলে ক্যাবলাই দে। কুইক্।'

বন্দার ভয়ে ক্যাবলাই পয়সা বের করল। শুধু কুইক্ নয়, ভেরি কুইক্।

ঝালমুড়ি চিবুতে চিবুতে টেনিদা বললে, 'এই গরমের ছুটিতে এক মাস আমি কোথায় ছিলুম বল্ দিকি?'

আমি বললুম, 'গোবরডাঙায়। সেখানে পিসীমার বাড়িতে তুমি আম খেতে গিয়েছিলে।'

'ওটা তো তোদের ফাঁকি দেবার জন্যে বলেছি। আমি গিয়েছিলুম হিমালয়ান এক্সপিডিশনে।'

'অ্যা— সৈত্য কইতাছ?'—হাবুল হাঁ করল।

'আমি কখনো মিথ্যে কথা বলি?'—টেনিদা গর্জন করল।

'বালাই ষাট—তুমি মিথ্যে বলবে কেন?'—ক্যাবলা ভালো মানুষের মতো বললে, 'কোথায় গিয়েছিলে? এভারেস্টে উঠতে?'

'ছো—ছো—ও তো সবাই উঠছে, ডাল-ভাত হয়ে গেছে। আর ক'দিন পরে তো স্কুলের ছেলেমেয়েরা এভারেস্টের চুড়োর বসে পিকনিক করবে। আমি গিয়েছিলুম—আরো উঁচু চুড়োর খোঁজে।'

'আছে নাকি?'—আমরা তিন জনেই চমকালুম।

'কিছুই বলা যায় না। হিমালয়ের কয়েকটা সাইড তো মেঘে কুয়াশায় চিরকালের মতো অন্ধকার—এখনো সে-সব জায়গার রহস্যই ভেদ হয়নি। লাস্ট্ ওয়ারের সময় দু-জন আমেরিকান পাইলট বলেছিল না? পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ওপরেও তারা পাহাড়ের চুড়ো দেখেছিল একটা—তারপর সে যে কোথায় হারিয়ে গেল—'

'তুমি সেই চুড়ো খুঁজে পেয়েছ টেনিদা?'—আমি জানতে চাইলুম।

'থাম ইডিয়ট। তা হলে তো কাগজে কাগজে আমার ছবিই দেখতে পেতিস। আমি কি আর তবে তোদের ওই সিটি কলেজের ক্লাসে বসে থাকতুম, আর প্রক্সি দিতুম? কবে আমাকে মাথায় তুলে সবাই দিল্লী-টিল্লী নিয়ে যেত—আমি কি বলে—একটা পদ্ম-বিভীষণ হয়ে যেতুম।'

ক্যাবলা বললে, 'উঁহু, পদ্ম-বিভূষণ।'

'একই কথা।' ঝালমুড়ির ঠোঙা শেষ করে টেনিদা বললে, 'চুপ কর—এখন ডিস্টার্ব করিসনি! না—নতুন চুড়ো খুঁজে পেলুম না। সেই যে কী বলে—পাহাড়ের কী তুষার ঝড়—'

ক্যাবলা বললে, 'ব্লিজার্ড।'

'হাঁ, এমন ব্লিজার্ড শুরু হল যে শেরপা-টেরপা সব গেল পালিয়ে। আমি আর কী করি, খুব মন খারাপ করে চলে এলুম কালিম্পঙে। সেখানে কুট্টিমামার ভায়রা-ভাই হরেকেষ্ট বাবু ডাক্তারী করেন, উঠলুম তাঁর ওখানে।'

'তা হলে ইয়েতি দেখলে কোথায়?'—আমি জানতে চাইলুম: 'সেই ব্লিজার্ডের ভেতর?'

'উঁহু, কালিম্পঙে।'

'কালিম্পঙে ইয়েতি।'—হাবুল চেঁচিয়ে উঠল: 'চাল মারনের জায়গা পাও নাই? আমি যাই নাই কালিম্পঙে? সেইখানে ইয়েতি? তা'ইলে তো আমাগো পটলডাঙায়ও ইয়েতি লাইমা আসতে পারে।'

টেনিদা ভীষণ গম্ভীর হয়ে বললে, 'পারে—অসম্ভব নয়।'

'অ্যা।'—আমরা তিন জনে খাবি খেলুম

টেনিদা বললে, 'হাঁ, পারে। ওরা ইন্‌ভিজিব্‌ল্‌—মানে প্রায়ই অদৃশ্য হয়ে থাকে। তাই লোকে ওদের পায়ের দাগ দেখে, কিন্তু ওদের দেখতে পায় না। যেখানে খুশি ওরা যেতে পারে, যখন খুশি যেতে পারে। আবার ইচ্ছে করলেই রূপ ধরতে পারে—কিন্তু সে রূপ না দেখলেই ভালো। আমি কালিম্পঙে দেখেছিলুম—আর দেখতে চাই না।'

আমি বললুম, 'কিন্তু ওখানে ইয়েতি এল কী করে?'

'ইয়েতি কোথায় নেই—কে জানে! হয় তো এই যে আমরা কথা কইছি—ঠিক এখুনি আমাদের পেছনে একটা অদৃশ্য ইয়েতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।'

আমরা ভীষণ চমকে তিনজনে পেছন ফিরে তাকালুম।

টেনিদা বললে, 'উঁহু, ইচ্ছে করে দেখা না দিলে কিছুতেই দেখতে পাবি না। ওকি এত সহজেই হয় রে বোকার দল? ওর জন্যে আলাদা কপাল থাকা চাই।'

ক্যাবলা বললে, 'তোমার সেই কপাল আছে বুঝি?'

হাঁটু থাবড়ে টেনিদা বললে, 'আলবৎ।'

হাবুল বললে, 'কালিম্পঙে ইয়েতি দ্যাখ্‌লা তুমি?'

'দেখলুম বই কি।'

ক্যাবলা বললে, 'রেস্তোরাঁয় বসে ইয়েতিটা বুঝি চা খাচ্ছিল? না কি বেড়াতে গিয়েছিল চিত্রভানুর ওদিকটায়?'

'ইয়ারকি দিচ্ছিস?'—বাঘা গলায় টেনিদা বললে, 'ইয়েতি তোর ইয়ারকির পাত্তর?'

হাবুল বললে, 'ছাড়ান্ দাও—পোলাপান।'

'পোলাপান? ওটাকে জলপান করে ফেলা উচিত। ফের যদি কক্লবকের মতো বকবক করবি ক্যাবলা, তা হলে এক ঘুষিতে তোর চশমাসুদ্ধু নাক আমি—'

আমি বললুম, 'নাসিকে উড়িয়ে দেব।'

'ইয়া—একদম কারেক্ট!'—বলে আমার পিঠ চাপড়াতে গিয়ে টেনিদার হাত হাওয়ায় ঘুরে এল—আগেই চট্ করে সরে গিয়েছিলুম আমি।

ব্যাজার মুখে টেনিদা বললে, 'ছুৎ—দরকারের সময় একটা পিঠ পর্যন্ত হাতের কাছে পাওয়া যায় না। রাবিশ।'

হাবুল বললে, 'কিন্তু ইয়েতি?'

'দাঁড়া না ঘোড়িড়িম—একটু মুড আনতে দে।'—টেনিদা মুখটাকে ঠিক গাজরের হালুয়ার মতো করে, নাকের ডগাটা খানিক খুচখুচ করে চুলকে নিলে। তারপর বললে, 'হুঁ—ইয়েতির সঙ্গে ইয়ার্কিই বটে। আমিও ইয়েতি নিয়ে একটু ইয়ার্কিই করতে গিয়েছিলুম। তারপরেই বুঝতে পারলুম—আর যেখানে ইচ্ছে চালিয়াতি করো—ওঁর সঙ্গে ফাজলেমি চলে না।'

আমি বললুম, 'চলল না ফাজলেমি?'

'না।'—খুব ভাবুকের মতো একটু চুপ করে থেকে টেনিদা বললে, 'হল কী জানিস, এক্স্পিডিশন থেকে ফিরে কালিম্পঙে এসে বেশ রেস্ট নিচ্ছিলুম। আর ডাক্তার হরেকেষ্ট বাবুর বাড়িতেও অনেক মুরগী—রোজ সকালে 'কঁকর-কঁকর' করে তারা ঘুম ভাঙাত, আর দুপুরে, রাত্তিরে—কখনো কারী, কখনো কাটলেট, কখনো রোস্ট্ হয়ে খাবার টেবিলে হাজির হত। বেশ ছিলুম রে! তা ওখানে একদিন এক ফরাসী টুরিস্টের সঙ্গে আলাপ হল। জানিস তো আমি খুব ভালো ফরাসী বলতে পারি—'

ক্যাবলা বললে, 'পারো বুঝি?'

'পারি না? ভি-লা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস—ইয়াক ইয়াক—তা হলে কোন্ ভাষা?'

হাবুল বললে, 'যথার্থ। তুমি কইয়া যাও।'

'লোকটার সঙ্গে তো খুব খাতির হল। এ-সব টুরিস্টদের ব্যাপার কী জানিস তো? সবকিছু সম্পর্কেই ওদের ভীষণ কৌতূহল। ইণ্ডিয়ানদের টিকি থাকে কেন—তোমাদের কাকেদের রং এত কালো কেন, তোমাদের দেবতা কি খুব ভয়ানক যে তোমরা 'হরিব্‌ল হরিব্‌ল' (মানে হরিবোল আর কি!) চ্যাচাও—ইণ্ডিয়ান গুবরে পোকা কি পাখিদের মতো গান গাইতে পারে, এদেশের ছুঁচোরা কি শুয়োরের বংশধর? এই সব নানা করা জিজ্ঞেস করতে করতে সে বললে, 'আচ্ছা মসিয়ো—তুমি তো হিমালয়াজে গিয়েছিলে, সেখানে ইয়েতি দেখেছ?'

আমার হঠাৎ লোকটাকে নিয়ে মজা করতে ইচ্ছে হল। তার নাম ছিল লেলেফাঁ। আমি বেশ কায়দা করে তাকে বললুম, তুমি আছো কোথায় হে মসিয়ো লেলেফাঁ? ইয়েতি দেখেছি মানে? আমি তো ধরেই এনেছি একটা।'

—'অ্যাঁ, ধরে এনেছ!'—লোকটা তিনবার খাবি খেলো: 'কই আজ পর্যন্ত কেউ তো ধরতে পারেনি!'

আমি লেলেফাঁ'র বুকে দুটো টোকা দিয়ে বললুম, 'আমি পটলডাঙার টেনি শর্মা—সবাই যা পাবে না, আমি তা পারি। আমার বাড়িতেই আছে ইয়েতি।'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ!'

মসিয়ো লেলেফাঁ খানিকটা হাঁ করে রইল, তারপর ভেউ ভেউ করে কাঁদার মুখ করলে, আবার কপ-কপ করে তিনটে খাবি খেল—যেন মশা গিলছে। শেষে একটু সামলে নিলে চোটটা।

'আমায় দেখাবে ইয়েতি?'

'কেন দেখাব না?'

শুনে এমন লাফাতে লাগল লেলেফাঁ যে একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। আর একটু হলেই গড়িয়ে হাত ত্রিশেক নীচে একটা গর্তে পড়ে যেত, আমি ওর ঠ্যাং ধরে টেনে তুললুম। উঠেই

আমাকে দু হাতে জাপটে ধরল সে আর পাক্কা তিন মিনিট ট্যাঙো ট্যাঙো বলে নাচতে লাগল।

'চলো, এক্ষুণি দেখাবে।'

আমি বললুম, 'সে হয় না মসিয়ো, যখন তখন তাকে দেখানো যায় না। সে উইকে সাড়ে তিন দিন ঘুমোয়, সাড়ে তিন দিন জেগে থাকে। ঘুমের সময় তাকে ডিস্টার্ব করলে সে এক চড়ে তোমার মুণ্ডু—'

আমি জুড়ে দিলুম, 'কাঠমুণ্ডুতে উড়িয়ে দেবে।'

টেনিদা বললে, 'রাইট। আমি লেলেফাঁকে বললুম, কাল থেকে ইয়েতি ঘুমুচ্ছে। জাগবে পরশু বারোটার পর। তারপর খেয়েদেয়ে যখন চাঙ্গা হবে—মানে তার মেজাজ বেশ খুশি থাকবে, তখন—মানে পরশু সন্ধ্যের পর তোমাকে ইয়েতি দেখাব।'

লেলেফাঁ বললে, 'আমার ক্যামেরা দিয়ে তার ছবি তুলতে পারব তো?'

'খবরদার, ও কাজটিও কোরো না। ইয়েতিরা ক্যামেরা একদম পছন্দ করে না—চাই কি খ্যাঁচ করে তোমার কামড়েই দেবে হয়তো। তখন হাইড্রোফোবিয়া হয়ে মারা পড়বে।'

'ইয়েতি কামড়ালে হাইড্রোফোবিয়া হয়?'

'হাইড্রোফোবিয়া তো ছেলেমানুষ। কালাজ্বর হতে পারে, পালাজ্বর হতে পারে, কলেরা হতে পারে, চাই কি ইন্দ্রলুপ্ত—এমন কি সমস্ত যণ্ডস্থ প্রত্যয় পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।'

ক্যাবলা প্রতিবাদ করল: 'সমস্ত যণ্ডস্থ প্রত্যয় কী করে—'

'ইয়ু শাটাপ্‌ ক্যাবলা—সব সময়ে টিকটিকির মতো টিকিস-টিকিস করবিনি বলে দিচ্ছি। শুনে লেলেফাঁ ফরাসীতে বললে, মী ঘৎ! মানে—হে ঈশ্বর।'

ক্যাবলা বললে, 'ফরাসীরা কি মী ঘৎ বলে নাকি?'

'শাটাপ্‌ আই সে!'—টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল: 'ফের যদি তক্কো করবি, তা হলে এখুনি এক টাকার আলুর চপ আনতে হবে তোকে। যাকে বলে ফাইন।'

ক্যাবলা কুঁকড়ে গেল, বললে, 'মী ঘৎ! থাক, আর তর্ক করব না, তুমি বলে যাও।'

'তবু তোকে আট আনার আলুর চপ আনতেই হবে। তোর ফাইন। যা—কুইক!'

আমি বললুম, 'হুঁ, ভেরি কুইক।'

বেগুনভাজার চাইতেও বিচ্ছিরি মুখ করে ক্যাবলা চপ নিয়ে এল।

'বেড়ে ভাজে লোকটা'—চপে কামড় দিয়ে টেনিদা বললে, 'যাকে বলে মেফিস্টোফিলিস!'

আমি আকুল হয়ে বললুম, 'কিন্তু ইয়েতি?'

'ইয়েস—ইয়েস, ইয়েতি। বুঝলি, আমার মাথায় তখন একটা প্ল্যান এসে গেছে। বাড়ি গিয়ে হরেকেষ্ট বাবুকে বললুম সেটা। কুট্টিমামার ভায়রাভাই তো, খুব রসিক লোক, রাজী হয়ে গেলেন। তারপর ম্যানেজ করলুম কাইলাকে।'

হাবুল বললে, 'কাইলা কেডা?'

'ও একজন নেপালী ছেলে—আমাদের বয়েসীই হবে। হরেকেষ্ট বাবুর ডাক্তারখানায় চাকরি করে। খুব স্ফূর্তিবাজ সে। বললে, দাজু, রামরো—মিরো। মানে—দাদা, ভালো, খুব ভালো।'

ওদিকে সায়েবের আর সময় কাটে না।

'তোমার ইয়েতি কি এখনো ঘুমুচ্ছে?'

'নাক ডাকাচ্ছে?'

'সময়মতো জাগবে তো?'

'সময়মতো মানে? ঠিক বারোটায় উঠে বসবে। এক সেকেণ্ডও লেট হবে না।'

যা হোক—দিন তো এল। হরেকেষ্ট বাবুর দোতলার হলঘরে আমি একটা কালো পর্দা টাঙালুম। প্ল্যান হল, খুব একটা ডিম লাইট থাকবে—আমি ধীরে ধীরে পর্দা সরিয়ে দেব। ইয়েতিকে দেখা যাবে। মাত্র দু মিনিট কি আড়াই মিনিট। তারপরেই আবার পর্দা ফেলে দেব।

আমি বললুম: 'কিন্তু ইয়েতি—'

'ইয়ু শাটাপ্—পটোল দিয়ে সিঙ্গি মাছের ঝোল! আরে, কিসের ইয়েতি? হরেকেষ্ট বাবুর বাড়িতে মস্ত একটা ভালুকের চামড়া ছিল, প্ল্যান করেছিলুম কাইলা সেটা গায়ে পরবে, আর একটা বিচ্ছিরি নেপালী মুখোস এঁটে গোটা কয়েক লাফ দেবে, চেঁচিয়ে বলবে—ড্রাম-ক্রম—ইয়াহু

—মিয়াহু! ব্যাস্, আর দেখতে হবে না, ওতেই মনিয়ো লেলেফাঁর দাঁতকপাটি লেগে যাবে।

সব সেইভাবে ঠিক করা রইল। সায়েব যখন এল, তখন ঘরে একটা মিটমিটে আলো—সামনে একটা কালো পর্দা, তার ওপর আমি কাল থেকে সায়েবকে ইয়েতি সম্পর্কে অনেক ভীষণ ভীষণ গল্প বলছিলুম। বুঝতে পারলুম, ঘরে ঢুকেই তার বুক কাঁপছে।

মজা দেখবার জন্যে হরেকেষ্ট ছিলেন, তাঁর কম্পাউণ্ডার গোলোকবাবুও বসে ছিলেন। বেশ অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ার তৈরী হয়ে গেলে—ওয়ান-টু-থ্রী বলে আমি পর্দাটা সরিয়ে দিলুম। আর—'

আমরা একসঙ্গে বললুম, 'আর?'

'একি! এ তো কাইলা নয়! তার ভালুকের চামড়া পড়ে গেছে, মুখোস ছিটকে গেছে—চিৎপাত অবস্থায় ব্যাঙের মতো হাত-পা ছড়িয়ে সে ঠায় অজ্ঞান। আর সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছাদ পর্যন্ত ছোঁয়া এক মূর্তি। সে যে কি রকম দেখতে আমি বোঝাতে পারব না। মানুষ নয়, গরিলা নয়—অথচ গায়ে তার কাঁটা-কাঁটা বাদামী রোঁয়া—চোখ দুটো জ্বলছে যেন আগুনের ভাঁটা। তিনটে সিংহের মতো গর্জন করে সে পরিষ্কার বাংলায় বললে, 'ইয়েতি দেখতে চাও—না? তবে নকল ইয়েতি দেখবে কেন, আসলকেই দেখো।' বলে হাঃ-হাঃ করে ঘর ফাটানো হাসি হাসল, তিরিশখানা ছোরার মতো ধারালো দাঁত তার ঝলকে উঠল, তারপর চোখের সামনে তার শরীরটা যেন গলে গেল, তৈরী হল একরাশ বাদামী ধোঁয়া—সেটা আবার মিলিয়ে গেল দেখতে দেখতে। আর আমাদের গায়ের ওপর দিয়ে বয়ে গেল যেন হিমালয়ের সেই ব্লিজার্ডের মতো একটা ঝড়ো হাওয়া, রক্ত জমে গেল আমাদের—বন্ধ দরজার পাল্লা দুটো তার ধাক্কায় ভেঙে দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল। তারপর সেই হাওয়াটা হা-হা করতে করতে শাল আর পাইন বনে ঝাপটা মেরে একেবারে নাথুলার দিকে ছুটে গেল।

আমি তো পাথর। সায়েব মেঝেতে পড়ে কেবল গিঁগিঁ করছে। কম্পাউণ্ডার অজ্ঞান। হরেকেষ্ট বাবু চেয়ারে চোখ উলটে আছেন, আর বিড়বিড় করে বলছেন—'কোরামিন—কোরামিন! সায়েবকে নয়—আমাকে দাও—এখুনি হার্ট ফেল করবে আমার।'

টেনিদা থামল। বললে, 'বুঝলি, এই হচ্ছে আসল ইয়েতি। তাকে নিয়ে ফস্টি-নষ্টি করতে যাসনি—মারা পড়ে যাবি। আর তাকে কখনো দেখতেও চাসনি—না দেখলেই বরং ভালো থাকবি।'

আমরা থ হয়ে বসে রইলুম খানিকক্ষণ। তারপর ক্যাবলা বললে, 'স্রেফ গুলপট্টি।'

'গুলপট্টি?'—টেনিদা কটকট করে তাকালো ক্যাবলার দিকে: 'ওরা অন্তর্যামী। বেশি যে বকবক করছিস, হয় তো এখুনি একটা অদৃশ্য ইয়েতি তার সিংহের মতো থাবা তোর কাঁধের ওপর বাড়িয়ে দিয়ে—'

'ওরে বাবা রে!'—এক লাফে রোয়াক থেকে নেমে পড়ে বাড়ির দিকে টেনে দৌড় লাগাল ক্যাবলা।
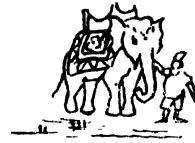
হাতিচড়া মেজাজ

গোঁফে চাড়া দিয়ে রামভরসবাবু বললেন, 'হাঁথি।'

যে-সব গরিব মানুষ তাঁর বৈঠকখানায় বসে হাত চালাচ্ছিল, তারা একসঙ্গে বললে, 'কোয়াবাৎ।'

কটমটে চোখে চারিদিকে তাকিয়ে রামভরস বললেন, 'হাঁথি ছাড়া আমাকে কখনো মানায়?'

লোকগুলো একসঙ্গে বললে, 'কভি নেহি, কভি নেহি।'

এবার খুসি হয়ে নিজের, ভুঁড়িতে-হাতির মতই প্রকাণ্ড এক ভুঁড়িতে, হাত বোলাতে লাগলেন রামভরস। ধনী মহাজন তিনি, বিস্তর টাকা, ধান-চালের চোরা কারবার করে সে টাকা আরো বেড়েছে। অতএব তাঁর সখ হয়েছে রাজা-বাদশাদের মতো একটা হাতি কিনে তার ওপরে চড়াও হবেন তিনি।

একজন বলেছিল, 'একটা মোটর গাড়ি কিনুন না বাবুসাহেব?'

শুনে চটেই গেছেন রামভরস।

'হাওয়া গাড়ি! আরে ছোঃ! ও তো যে কেউ কিনছে, হরদম কিনছে। ওতে চড়লে কি আর মান থাকে আজকাল? হাঁথিই হচ্ছে অস্‌লী চীজ। খাঁটি আমিরী ব্যাপার।' তারপর থেকে তিনি এই একটি কথাই বলছেন: 'হাঁথি।'

পেটের দায়ে গাঁয়ের গরিব মানুষগুলোর মাথা পর্যন্ত তাঁর কাছে বাঁধা। তারা সবাই ঘাড় নেড়ে বললে, 'ঠিক বাত—ঠিক বাত। আমির আদমির হাঁথিই তো চাই।'

টাকা থাকলে হাতি তো হাতি—লোকে গণ্ডার জলহস্তীর ওপরেও চড়াও হতে পারে। অতএব হাতি এসে গেল যোধপুরের হরিহর ছত্রের মেলা থেকে।

আর সেই হাতিতে—পেল্লায় শরীর আর ঝলমলে পোষাকে চারিদিক আলো করে—রামভরস বেরুলেন।

দিগ্বিজয়েই বেরুলেন বলতে গেলে।

দুধারে লোক মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দেখছে—হাতির পেছনে ছুটে আসছে বাচ্চার দল। লোক জড়ো হয়ে যাচ্ছে এখানে ওখানে। গোঁফে চাড়া দিচ্ছেন রামভরস—নিজেকে তাঁর জাঁহাগীর বাদশার মতো মালুম হচ্ছে এখন। ভাবলেন—এর পরে একজন ছাতাওলা নিয়ে বেরুবেন—সে তাঁর মাথার ওপরে রাজছত্র ধরে থাকবে।

কিন্তু হঠাৎ বেয়াড়া ব্যাপার হয়ে গেল একটা।

একটা ছোট গঞ্জের ভেতর দিয়ে হাতি এগোচ্ছে তখন। চকিতে রামভরসের কানে এল কয়েকটা বালককণ্ঠ।

'দেখো দেখো ভাইয়া—হাঁথি দেখো।'

'কোন্ হাঁথি হো?'—কে আর একজন চেঁচিয়ে উঠল: 'উপরওয়ালা ইয়া নীচাওয়ালা?'

অর্থাৎ কিনা—কোন্ হাতিটাকে দেখব রে? ওপরেরটা, না নীচেরটা?

আর সঙ্গে সঙ্গে খিল খিল করে হাসির বান।

কেয়া। বাদশা জাহাঙ্গীরের মেজাজ তড়াং করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে—তাঁকে হাতি বলছে! অপমান করছে! এই গাঁয়ের সব মানুষ তাঁর খাতক, আর এদের এতোবড়ো আস্পর্ধা যে—

'হো-হো ভেইয়া—দো-দো হাঁথি। এক উপরমে, এক নীচুমে।' আবার হাসির কলরোল। কয়েকটি বয়স্ক মানুষও খুক-খুক করে হেসে উঠল সেই সঙ্গে।

'হাঁথি বৈঠাও।'—গর্জন করলেন রামভরস। চমকে গিয়ে মাহুত হাতি বসাতেই, তার ল্যাজের দিকের দড়ি ধরে সড়াৎ করে নেমে পড়লেন হাঁথি-চড়া আমির।

তারপর চারদিকে তাকিয়ে এক হুঙ্কার: 'কৌন্ মুঝে হাঁথি বোলা?'

অর্থাৎ—হাতি বলেছে কে আমাকে?

লোকগুলো আঁতকে সরে গেল। কয়েকটা বাচ্চা দৌড় লাগাল এদিক-ওদিক।

'কোন্ মুঝে হাঁথি বোলা-আ?'

সব চুপ।

সামনে টুপিপরা রোগা মতন একজনকে পেয়েই ক্যাঁক করে তার ঘাড় চেপে ধরলেন রামভরস। প্রচণ্ড টিপুনিতে সে লোকটার দম আটকানোর জো।

'বোলো—জলদি বোলো—'

গ্যাঙাতে গ্যাঙাতে সে লোকটা বললে, 'হাম্ নেহি—হাম্ নেহি। উয়ো বিষণোয়া বোলা।'

'কৌন্ বিষ্‌ণোয়া ?'

লোকটার চোখ কপালে উঠে গেল : 'বিষ্‌ণোয়া ভাগা।'

'কাঁহা ভাগা ?'

'ওই ওধার—'

রামভরস দেখলেন, লেংটিপরা—মাথায় লাল গামছা বাঁধা একটা বাচ্চা ছেলে পাঁই পাঁই করে ছুটছে মাঠের ভেতর দিয়ে।

রামভরস চারদিকে তাকিয়ে গর্জন করলেন : 'এই পাকড় লাও উস্‌কো।'

কেউ নড়ল না। একজন বললে, 'উ ইঁটা মারেগা।' অর্থাৎ ঢিল মারবে।

'ইঁটা মারেগা ? আচ্ছা—' বলে রামভরস নিজেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে তাড়া করলেন ছোকরাকে। একেবারে মত্ত হস্তীর মতোই।

বলা অনাবশ্যক, ছেলের দলও ছুটল তাঁর পেছন পেছন।

বিষ্‌ণোয়া—অর্থাৎ বিষ্‌ণা—পেছনে তাকিয়েই 'হায় রাম'—বলে কঁকিয়ে উঠল। তোমরা তো জানো—বুনো জানোয়ারদের ভেতর হাতির মতো দৌড়বাজ আর কেউ নয়। রামভরস যে হাতি, সেটা তিনিও প্রমাণ করছেন। এখন দুধ-দই-রাবড়ি-মালাই খেয়ে পেল্লায় মোটা হয়েছেন বটে, কিন্তু আসলে তিনি সাংঘাতিক জোয়ান—ফাঁকে পেলে এখনো ল্যাঙট পরে—মাটি মেখে কুস্তি লড়েন। একেবারে কাল্‌কা মেলের এঞ্জিনের মতো ছুটে আসছেন তিনি।

'হায় রাম—' বিষ্‌ণা ভাবল, গেছি এবার।

কপাল খারাপ, শুধুই মাঠ। একটা বাড়ি ঘরও নেই যে ঢুকে পড়বে তার ভেতর। রাস্তা হলেও এদিক সেদিক করে সট্‌কে পড়া যেত। কিন্তু এই মাঠের মধ্যে—ওই দানোর হাত থেকে তাকে বাঁচায় কে ?

পেছন থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে—ষাঁড়ের মতো চ্যাচাতে চ্যাচাতে তাকে অভয় দিচ্ছেন রামভরস : 'ঠহ্‌র যা—ঠহর যা বদমাস। তেরে টেংরি উখাড় লিবে হম্‌!'

অর্থাৎ—থাম বদমাস, থাম। তোর ঠ্যাং ছিঁড়ে নেব আমি।

এমন অভয় পেলে কে আর দাঁড়ায়! বিষ্‌ণা আরো জোরে ছুটতে লাগল।

কিন্তু গরিব চাষীর ছেলে, একবেলা খেতে পায় কি, পায় না। রোগা রোগা পায়ে সে কী করে পাল্লা দেবে ওঃ দুম্‌কো জোয়ানের সঙ্গে! রামভরস আরো কাছিয়ে আসতে লাগলেন।

'তেরে হড্ডি হম্‌ চক্‌নাচুর করেঙ্গে।'

তোর হাড় আমি গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলব—চানাচুরই করে ফেলব বলা যায়!

'হায় বাপ—জান গই রে—' বলে বিষ্‌ণা দৌড়োতে লাগল, কিন্তু রামভরস প্রায় দশ গজের মধ্যে এসে পড়েছেন তখন।

'পকড় লিয়া—পকড় লিয়া—' পেছন থেকে বাচ্চাদের কোলাহল।

কিন্তু বিষ্‌ণা বেঁচে গেল। মাঠের ভেতর এক রাশ কাদা—মোটা মানুষ রামভরসের তাতে পা পড়ল, এবং—এবং ধপাস্‌।

চারপা তুলে একটা দুর্ধর্ষ আছাড় খেলেন তিনি।

গেল মলমলের ধুতি—ঝলমলে জামা, ঝকঝকে জুতো! ব্যথা তো লাগল, তার চেয়েও—

তার চেয়েও মর্মঘাতী পেছনে বাচ্চাদের করতালি।

'হো-হো—মোটাবাবু গির গয়া!'

দাঁতে দাঁতে ঘষলেন রামভরস। চিৎকার করে বললেন, 'সব কোইকো লাড্‌ডু বনায়কে খায়েঙ্গে হম্‌!'

সবগুলোকে আমি লাড্ডু বানিয়ে খাব! বাচ্চার দল—'আঁই বাপ' বলে উল্‌টো দিকে ছুটল, রামভরস আবার তাড়া করলেন বিষ্‌ণাকে।

তাঁর খুন চেপে গেছে তখন।

বিষ্‌ণা একটু এগিয়ে গিয়েছিল—কিন্তু কতক্ষণ আর! আবার এসে পড়েছেন রামভরস। ধরলেন—এই ধরলেন বলে। কিন্তু এবারও ফসকালো। কোত্থেকে দুটো ষাঁড় মারামারি করতে করতে এসে গেল দু'জনের মাঝখানে।

রামভরস দাঁড়ালেন, পিছু হঠলেন, ষাঁড়ের পাশ কাটিয়ে আবার ছুটলেন। বিষ্‌ণা তাকিয়ে দেখল—আর উপায় নেই। এবারে নির্ঘাত ধরলেন, টেংরি উখাড় লেবেন, হড্ডি চকনাচুর করবেন, তারপর লাড্ডু পাকিয়ে খেয়ে নেবেন।

'জান গইরে—হায় সীতারাম—' কাঁদতে কাঁদতে বিষ্‌ণা ছুটল। কী কুক্ষণেই মোটাবাবুকে হাঁথি বলেছিল সে! হাতির হাতে পড়ে সত্যিই এবারে প্রাণ যায়!

সীতারাম বোধ হয় স্বর্গ থেকে কান্না শুনলেন বেচারীর। ফস করে একটা মাঝারি সাইজের গাছ জুটিয়ে দিলেন সামনে। আর তড় তড় করে বিষ্‌ণা উঠে পড়ল তাতে।

গাছের গোড়ায় পৌঁছালেন রামভরস। মিনিট দু-তিন কালকা মেলের স্টিম ছাড়বার মতো নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। তারপর বিষ্‌ণাকে ডেকে বললেন, 'উতারো!'

ওপর থেকে কান্নাভেজা আওয়াজ এল: 'নেহি।'

'জল্‌দি উতারো।'

'নেহি উত্‌রেঙ্গে।'

'তুম্‌কো হম্‌ হালুয়া বনায়েঙ্গে, খিঁচড়ি পকায়েঙ্গে। (তোমাকে আমি হালুয়া বানাব, খিঁচুড়ি পাকাব।) উতার আ বদ্‌মাস—'

এমন সান্ত্বনা পেলে কে নামে: 'হম্‌ উতরেঙ্গে নেহি!'

রামভরস ভাবতে লাগলেন—কী করা যায়!

সেই সময় পেছন থেকে আবার বাচ্চাদের চিৎকার: 'হো-হো-মোটাবাবু পেড়মে চড়নে নাহি সকতা!' (আরে মোটাবাবু গাছে চড়তে পারে না!)

'খামোশ! চুপ রহো—' আবার আকাশ ফাটিয়ে চ্যাচালেন রামভরস। বটে—তিনি গাছে উঠতে পারেন না। ছেলেবেলায় কত আমরুদ (পেয়ারা), আম, জাবুন (জাম)—এইসব গাছে বাঁদরের মতো লাফিয়ে বেড়িয়েছেন, আর এই গাছে উঠতে পারবেন না।

কাদামাখা জুতো খুলে ফেললেন, কাপড়টা আরো কষে পরলেন।

'হম্‌ তোম্‌কো উতার লায়েঙ্গে'—অর্থাৎ আমিই তোমায় নামিয়ে আনছি।

তারপর হাঁক পাঁক করে সোজা গাছে উঠে গেলেন।

'হায় রাম—মর গই রে।'—বিষণা ডুকরে উঠল : 'মুঝে ছোড় দিজিয়ে বাবুজী।'

'ছোড়েঙ্গে! তুম্‌কো লড্ডু পকায়কে—' রামভরস উঠতে লাগলেন ওপরে।

আতঙ্কে ছেলের দল স্তব্ধ। 'এ বাপরে—মর গইরে'—তারস্বরে কাঁদতে কাঁদতে বিষ্‌ণা একেবারে মগ ডালে গিয়ে চড়াও হল।

'কাঁহা ভাগে গা বদমাস? হড্ডি তোড়কে—'

রামভরস আরো ওপরে উঠলেন, বিষ্‌ণার দিকে হাতির শুঁড়ের মতো প্রকাণ্ড হাতখানা বাড়ালেন, এবং অতঃপর—

অতঃপর বেচারী গাছ! তার ডালে যে কোনোদিন হাতি চড়বে সে তো তার জানা ছিল না। ঘড়-ঘড়-ঘড়াৎ করে একটা শব্দ হল, আর—

আর সেই পাক্কা সাড়ে তিন মণ একেবারে সবেগে আছড়ে পড়লেন। যেন ভূমিকম্প হয়ে গেল চারদিকে।

কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে জন বারো লোক! নইলে অত বড়ো লাশ টানা যাবে কী করে?

গায়ে অসহ্য ব্যথা—একটা পা-ই ভেঙে গেল কিনা কে জানে! গ্যাঁ-গ্যাঁ করে অতি কোমল স্বরে রামভরস বললেন, 'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ হে?'

একজন বললে, 'জী—বাজারপর দাওয়াখানা মে।'

অর্থাৎ—বাজারের দাওয়াখানায়।

তাই নিয়ে চলুক। একটু মলম-টলম মালিশ করে দিলে যদি উঠে দাঁড়ানো যায়।

বারোজনের কাঁধে সোয়ার হয়ে যেতে যেতে রামভরস শুনলেন—দূরে যেন কারা ছড়া কাটছে! তার মানেটা এই রকম :

'কখনো হাতির পিঠে হাতি চড়ে,
কখনো মানুষের ঘাড়ে হাতি চড়ে!'

কিন্তু এবার আর দাপিয়ে উঠলেন না রামভরস। হাতি চড়া জাহাঙ্গীর বাদশার মেজাজ এতক্ষণে একেবারে ঠাণ্ডা জল।

দাওয়াই

কেষ্টগোপালবাবুকে লোকে বলে কাষ্ঠগোপাল।

অকারণে বলে না। একটা মিষ্টি কথা বলবারও অভ্যেস নেই ভদ্রলোকের। কারণে অকারণে লোককে যা-তা বলে তাদের মন খারাপ করে দিতে তিনি ভয়ানক ভালোবাসেন।

এই ধরো, পটলা অঙ্কে ফেল করে ক্লাসে প্রমোশন পেল না। তিন দিন ধরে ছেলেটা খালি কেঁদেছে, তাকে দেখলে সকলেরই দুঃখ হয়, কেবল কাষ্ঠগোপালের হয় না। পটলাকে আরো কষ্ট দিয়ে মনে মনে তিনি ভারী আরাম পান।

বাজারের ভেতর দিয়ে হয়তো পটলা যাচ্ছে, চারদিকে লোকজন, তার মধ্যে গলা চড়িয়ে কাষ্ঠগোপাল বললেন, কিরে পটলা, অঙ্কে নাকি তুই তিন পেয়েছিস ?

পটলা যে দৌড়ে পালাবে তারও জো নেই। রাস্তা জুড়ে কাষ্ঠগোপাল দাঁড়িয়ে।

—তা তিন তো পাবিই। যেমন তোর নীরেট মগজ! একেবারে যে গোল্লা পাসনি, এই তোর বরাত বলতে হবে!

অত লোকের সামনে ডুকরে কেঁদে ওঠবার উপায়ও নেই পটলার। লাস্তের মধ্যে যারা খবরটা জানত না তারাও জেনে গেল। আর রসিয়ে রসিয়ে কাষ্ঠগোপাল বলতে থাকলেন: ওরে, লেখাপড়া না করে তুই বরং জলে ডুবতে যা। কালিদাসের বেলায় যেমনটা হয়েছিল—তেমনি যদি মা সরস্বতী তোকে দয়া করতে আসেন, তা হলে এ যাত্রা তরে গেলি। নইলে সামনের পরীক্ষায় যদি তুই অঙ্কের খাতায় পাঁচও পাস তো—

এবার ভ্যাঁক করে কেঁদেই ফেলল পটলা। আর তাই দেখে মিটমিট করে হাসতে লাগলেন কাষ্ঠগোপাল।

বিশ্বনিন্দুকে লোক। কিচ্ছু পছন্দ হয় না কাষ্ঠগোপালের। পড়ায় কোনো বাড়ীতে বিয়ে-টিয়ে হলে ভদ্রতার খাতিরেও তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে হয়। আর খেতে বসে কী করেন কাষ্ঠগোপাল?—আরে ছ্যা, এর নাম লুচি? এ যে জুতোর চামড়া হে। পচা ভেজিটেবল ঘি জোটালে কোত্থেকে? রাম–রাম, এ-রকম বাজে মাছের কালিয়া তো কখনো খাইনি। অ্যা—এগুলো রসগোল্লা নাকি? তা হলে আর সুজির পিণ্ডি কাকে বলে?

কেউ যদি বলে, আমাদের তো ভালোই লাগছে—কাষ্ঠগোপাল তাকে ঠাট্টা করতে থাকেন। বলেন, পরের পয়সায় যে খাচ্ছ হে! জুতোর সুখতলাও অমৃতির মতো মনে হবে, মার্বেল খেতে দিলেও বলবে জনাইয়ের মনোহরা খাচ্ছি।

এই হলেন কাষ্ঠগোপাল। কিন্তু লোকে তাঁকে চটাতে সাহস পায় না। তাঁর অনেক টাকা, আর পাড়ার অর্ধেক বাড়ীর তিনি মালিক।

পাড়ায় নতুন বাড়ী করে এসেছেন মার্তণ্ড বাবু। রাশভারী চেহারার লোক। কী যেন সরকারী চাকরী করতেন, এখন রিটায়ার করেছেন। প্রায়ই বই-টই পড়েন আর সকালে-বিকালে একটা লাঠি হাতে নিয়ে দেশ-বন্ধু পার্কে বেড়াতে যান।

কাষ্ঠগোপাল গিয়ে হাজির হলেন তাঁর কাছে। নতুন লোক, আলাপ তো করা চাই। তা ছাড়া ফাঁক পেলে দুটো কড়া কথাও বলে আসবেন।

মার্তণ্ড বাবু একটা মস্ত চামড়া-বাঁধানো ডেক-চেয়ারে বসে একটা ইংরিজি বই পড়ছিলেন। কাষ্ঠগোপালকে দেখে বইটা নামিয়ে বললেন, আসুন। বসুন।

—আলাপ করতে এলুম।

চশমার ভেতর দিয়ে তাঁকে ভালো করে দেখে নিলেন মার্তণ্ড। তারপর বললেন, বেশ।

একবার এদিকে ওদিকে তাকিয়ে কাষ্ঠগোপাল বললেন, এ পাড়ায় বাড়ী করলেন কেন?

—এমনি। ভালো লাগল।

—না মশাই, অতি নচ্ছার পাড়া। লোকগুলো খুব বাজে।

—তাই নাকি?—হঠাৎ মার্তণ্ড জিজ্ঞেস করলেন: আপনিও বুঝি খুব বাজে।

কথাটা শুনে একটা বিষম খেলেন কাষ্ঠগোপাল: না—না—ইয়ে—আমি বাজে লোক নই। পাড়ায় একমাত্র ভালো লোক আমাকেই বলতে পারেন।

মার্তণ্ড বললেন, শুনে সুখী হলুম। তা কী খাবেন? চা? না ঘোলের সরবৎ?

কাষ্ঠগোপাল বললেন, বড্ড গরম পড়েছে আজ। ঘোলের সরবৎই ভালো।

মার্তণ্ড ঘোলের সরবৎ আনতে বলে দিলেন চাকরকে। কাষ্ঠগোপাল ভাবতে লাগলেন, এইবারে কী বলা যায়।

—অনেক খরচ করে বাড়ী করলেন মশাই, কিন্তু ভালো হয়নি।

মার্তণ্ড বললেন, ভালো হয়নি বুঝি? সবাই তো প্রশংসা করেছে বাড়ীর।

—ও তো মুখের প্রশংসা মশাই। এ আবার বাড়ীর একটা ডিজাইন নাকি? তা ছাড়া সব বাজে মাল-মশলা দিয়ে তৈরী মশাই, দেখবেন—এক বছরেই বাড়ীতে ফাট ধরে যাবে।

—ফাট ধরে যাবে?

যাবেই তো। কন্‌ট্রাক্‌টাররা কী করে? যেমন তেমন করে কেবল পয়সা আদায়ের ফন্দি, যা তা একটা তৈরি করে দিলেই হল।

—অ।—মার্তণ্ড আবার কাষ্ঠগোপালের দিকে তাকালেন: কিন্তু এ বাড়ী তো কন্‌ট্রাক্‌টারে করেনি। আমার বড়ো ছেলে এন্‌জিনীয়র, সেই-ই দাঁড়িয়ে থেকে করিয়েছে।

—ও—ও।—কাষ্ঠগোপাল একটু ঘাবড়ালেন: তা হলে মাল-মশলা ভালোই আছে। কিন্তু আপনি যা-ই বলুন, ডিজাইনটা ভালো হয়নি।

কপাল কুঁচকে মার্তণ্ড কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন কাষ্ঠগোপালের দিকে। আর এর মধ্যে চাকর ঘোলের সরবৎ নিয়ে এল।

চমৎকার সরবৎ। মশলা-টশলা দিয়ে অনেক যত্ন করে তৈরী—নিন্দে করবার কিছু নেই। কিন্তু এক চুমুক খেয়েই নাক কুঁচকে উঠল কাষ্ঠগোপালের।

মার্তণ্ড বললেন, সরবৎ আপনার পছন্দ হয়নি বোধ হয়?

কাষ্ঠগোপাল বললেন, সত্যি কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না। না—পছন্দ হয়নি।

মার্তণ্ড শান্ত গলায় বললেন, কি রকম আপনার পছন্দ?

—এ দই দোকান থেকে আনিয়েছেন তো?

—আর কোথায় পাব?

—তাই। আরে দোকানের দই কি আর দই মশাই, ও তো অর্ধেক চুনের গোলা।

বিনীত হয়ে মার্তণ্ড বললেন, তা হলে ভালো দই কোথায় পাব বলতে পারেন?

—বলছি, শুনুন।—খুশি হয়ে কাষ্ঠগোপাল টেবিলে একটা চড় মারলেন: সে দই—সে ঘোল খেয়েছিলুম আমার পিসিমার বাড়ীতে—হরিপালে। মানে তারকেশ্বর লাইনে যে হরিপাল আছে, সেখানে।

মার্তণ্ড বললেন, বলে যান।

—আগের দিন গোরু দোয়ানো হল। সেই টাট্‌কা দুধ ক্ষীরের মতো জ্বাল দিয়ে সন্ধ্যেয় দই পাতা হল। সেই দই থেকে পরদিন দুপুরে যখন ঘোল তৈরী হল—

বাধা দিয়ে মার্তণ্ড বললেন, বুঝেছি, বুঝেছি! আমিই সে ঘোল খাওয়াতে পারি আপনাকে। একেবারে সেই জিনিস।

হকচকিয়ে কাষ্ঠগোপাল বললেন, সেই জিনিস?

—একেবারে। কোনো খুঁত পাবেন না।

বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন মার্তণ্ড। কাষ্ঠগোপালকে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে।

কাষ্ঠগোপাল কেমন চমকে গেলেন।

—কোথায় যেতে হবে ?

—আসুন বলছি।

বাপরে, কি গলার আওয়াজ মার্তণ্ডের। পিলে চমকে গেল কাষ্ঠগোপালের। মার্তণ্ড আবার সেই বাঘা স্বরে বললেন, আসুন শিগ্‌গীর।

অগত্যা উঠে পড়লেন কাষ্ঠগোপাল। তাকে সোজা দোতালায় নিয়ে গিয়ে একটা ছোট ঘরের দরজা খুলে দিলেন মার্তণ্ড। বললেন, ঢুকুন ওর মধ্যে।

—অ্যাঁ।—ওখানে কী ?

—ঘোলের সরবৎ। আপনি যেমন চেয়েছেন। ঢুকুন।

প্রায় ঠেলেই কাষ্ঠগোপালকে ভেতরে ঢোকালেন মার্তণ্ড। তারপর খট্-খটাং। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ।

চেঁচিয়ে কাষ্ঠগোপাল বললেন, একি ব্যাপার মশাই মার্তণ্ড বাবু। দোর বন্ধ করলেন কেন ? খুলুন—খুলুন—

বাজের মতো আওয়াজ তুলে বাইরে থেকে মার্তণ্ড বললেন, আমি ঘোলের সরবৎ স্পেশ্যাল মশলা দিয়ে তৈরী করি—যে খায় সে-ই শতমুখে প্রশংসা করে। আপনি তার নিন্দে করলেন ! ঠিক আছে, আপনি যা চান, তাই খাওয়াব।

—কিন্তু এ ঘরে সরবৎ কোথায় মশাই ! মিস্তিরিদের ক'টা চুণের টিন, ক'টা বাঁশ—

—আসবে সরবৎ আসবে। আমি এখুনিহাটে লোক পাঠাচ্ছি, সন্ধ্যের মধ্যে সে লোক ফিরে আসবে। কাল দুধ দোয়ানো হলে—কাল সন্ধ্যায় ক্ষীর তৈরী করে দই পাতা হবে। সেই দই থেকে পরশু দুপুরে ঘোল হবে। সেই ঘোল খেয়ে তবে আপনি এ ঘর থেকে বেরুবেন, তার আগে নয়।

বলে, মার্তণ্ড চলে গেলেন।

—ও মশাই—ও মশাই—একি রসিকতা ! খুলে দিন বলছি—কাতরস্বরে চ্যাচাতে লাগলেন কাষ্ঠগোপাল। কেউ সাড়া দিল না।

ভাগ্যিস, ঘরের ছোট জানালাটায় শিক-টিক কিছু ছিল না। প্রাণের দায়ে সেইটে দিয়ে ঝাঁপ মারলেন কাষ্ঠগোপাল—পড়লেন একটা পচা-ডোবার ভেতরে। ঘোলের বদলে এক পেট কাদাজল খেয়ে তিনি উঠে পড়লেন, তার-পর সেই যে ছুটলেন—

অলিম্পিকের দৌড়ও তার কাছে লাগে না !

ওস্তাদে ওস্তাদে

দারুণ গরমে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বজ্রেশ্বর গড়গড়ির ঘুম ভাঙল।

ঘরে ইলেকট্রিক পাখা ঘুরছিল, সেটা কখন থেমে গেছে। একটা পাঁচ পাওয়ারের নীল বেড-সাইড ল্যাম্প জ্বলে, সেটাও নিবে রয়েছে। বাইরের জানালায় গুমোট মেঘে ঢাকা থমথমে ভাদ্রের আকাশ, চারিদিকে নীরেট অন্ধকার, ঘরের ভেতরে যেন সারি সারি কষ্টিপাথরের দেওয়াল তুলে দিয়েছে ঢেউ। তার মানে, আজও ইলেকট্রিক ফেল করেছে। প্রায়ই এই কাণ্ড হচ্ছে আজকাল, জ্বালাতন করে মারল তবু দেখা যাক একবার। বিছানা ছেড়ে উঠতে গেলেন বজ্রেশ্বরবাবু।

তখন কে যেন কর্কশ খসেখসে গলায় বললে, বিছানা থেকে নাববেন না, যেমন আছেন তেমনি থাকুন।

বজ্রেশ্বর বুঝলেন, অন্ধকারে যদিও তিনি কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না,

কিন্তু ঘরে আর একজন কেউ আছে, যে তাঁকে দেখছে এবং লক্ষ্য করছে। সে যে কে হতে পারে, চালাক-লোক গড়াগড়ির সেটা বুঝতে একটুও দেরী হল না। তবু ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করলেন, মাঝরাতে আমার ঘরে ঢুকে আলো-ফালো নিবিয়ে ভূতের মতন বসে রয়েছেন, কে আপনি ?

উত্তর এল : আমি ভূত।

—তা, ভূত। তা গরম-টরম লাগছেনা আপনার ? আলো না হয় না-ই জ্বাললেন, কিন্তু পাখাটা খুলতে আপত্তি আছে কি ?

—আপত্তি ছিল না, কিন্তু নিচের মেইন সুইচ্ অফ করে দিয়েছি।

—ভালোই করেছেন।—গড়গড়ি বিরক্ত হলেন: তা হলে গরম আর ঘামে হালুয়া হোন বসে বসে।

—বেশিক্ষণ বসতে আসিনি। একটু দরকার আছে আপনার সঙ্গে। সেটা মিটলেই চলে যাব।

—কী, ঘাড় মটকাতে চান ?—গড়াগড়ি গম্ভীর হয়ে বললেন, ওতে সুবিধা হবে না। আমার বয়সে হয়েছে বটে, কিন্তু ছেলেবেলায় মশাই জাপানী ওস্তাদের কাছে যুযুৎসু শিখেছিলুম, তার একটা প্যাঁচও আমি ভুলিনি। ওসব চালাকির চেষ্টা করবেন না। আর যদি ভেংচি টেংচি কেটে ভয় দেখাতে চান, তা হলে আলোটা জ্বালুন, নইলে চাঁদমুখ দেখব কী করে ! অন্ধকারে আপনার ভ্যাংচানি স্রেফ বাজে খরচ হয়ে যাবে।

ভূত জবাব দিলে না। ঘুর-ঘুর-ঘুঙ-ঘুঙ করে খানিকটা কাশল।

—কি রকম বিচ্ছিরি করে কাশলেন আপনি। হুপিং কাশি আছে নাকি ?

—কী বকছেন পাগলের মতো ?—ভূত বিরক্ত হল : আপনি না একজন সাইন্টিস্ট্। বুড়ো বয়েসে কারো হুপিং কাফ হয় ?

—ভূতের খবর কী করে জানব মশাই ?—কোঁচায় খুঁটে হাওয়া খেতে খেতে গড়াগড়ি বললেন, কখনো তো রিসার্চ করবার সুযোগ পাইনি। আপনিই হচ্ছেন আমার জীবনের প্রথম ভূত। অবশ্যি আমার এক ভাই-পো ছিল—তার নাম ভূতো, ছেলেবেলায় গায়ে কালি-ঝুলি মেখে থাকত বলে আমি তাকে ডাকতুম ভূত। কিন্তু এখন সে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে—লোকে বলে কমলাক্ষবাবু—ভূত কিংবা ভূতো নামে তাকে যদি আপনি ডাকেন, সে রেগে গিয়ে আপনাকে জেল দিতে পারে।

শুনে, ভূত একটা হাই তুলল। বললে, আপনার সেই কমলাক্ষকে আমি ভূত বা ভূতো কোনো নামেই ডাকতে চাই না—ডাকবার কোনো দরকার দেখছি না। আমি আপনার কাছেই এসেছি।

—আমার কাছে এসেছেন তো সুইচ-টুইচ বন্ধ করে দিয়ে অন্ধকারে হুতুম-থুমোর মতো বসে রয়েছেন কেন? কী বলতে চান চটপট বলে ফেলুন। আপনারা নয় রাত্তিরে চরে বেড়ান, কিন্তু আমাদের যে এটা ঘুমোবার টাইম সে-কথা ভুলে যাবেন না। কথাবার্তা শেষ করে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন, কাল সকালে আবার আমার গোটাকয়েক শক্ত শক্ত অঙ্ক কষতে হবে।

উত্তরে ভূত আবার খুঙ খুঙ করে কাশল।

—এঃ, এ কাশি তো আপনার ভালো নয়। ক্রণিক বলে মনে হচ্ছে। ভালো ডাক্তার দেখান মশাই, শেষকালে আবার একটা টি-বি ফি-বি হয়ে যেতে পারে।

—দেখুন, ওসব অলক্ষুণে কথা বলে কু-ডাক ডাকবেন না। শুনলেই বুক কেঁপে ওঠে। টি-বি আমার হবে কেন? আমার শত্তুরের হোক!

—তা হোক। কিন্তু আপনার শত্তুর কে? ভূতের রোজা বুঝি?

—শুধু ভূতের রোজা কেন। অনেকেই আছে। তার মধ্যে আপনিও একজন।

—আমিও? বজ্রেশ্বর গড়গড়ি একটা খাবি খেলেন: আমাকে আবার টানছেন কেন এর ভেতর? আমি তো মশাই ভূত-সম্পর্কে কোনোদিন কোনো কমেণ্ট করিনি। ভূত বিশেষ মানি টানি না বটে, কিন্তু চিরকাল তাদের সমীহ করে থাকি।

—বকবকানি রাখুন। এবার কাজের কথা হোক।

—হোক কিন্তু বেশি দেরী করবেন না—আমার একটু ঘুমুনো দরকার।

—শুনুন। আপনি কালকের খবরের কাগজে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে জানিয়েছেন, বাড়ীতে আপনি একা থাকেন, সদর বন্ধ করেন না, আলমারির চাবি খুলে রাখেন আর সেই আলমারীতে নগদ দশ হাজার টাকা রেখে দিয়েছেন। সত্যি কি না?

কানের কাছে একটা মশা অন্ধকারে পিন্ পিন্ করে উড়ছিল। সেটাকে মারবার ব্যর্থ চেষ্টায় গড়াগড়ি দু হাতে চটাস্ করে তালি বাজালেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ—সত্য।

—সেই প্রবন্ধে আপনি আরো লিখেছেন যে ভারতবর্ষে এমন কোনো চোর নেই যে আপনার আলমারী থেকে সে টাকা চুরি করতে পারে। কারণ আপনার ঘুম খুব পাতলা—নেংটি ইঁদুরের পায়ের আওয়াজে পর্যন্ত আপনি জেগে ওঠেন। আপনার বালিশের নীচে দু দুটো টোটা ভরা রিভলভার থাকে, আর আপনি দু হাতে গুলি চালাতে পারেন। এক কথায় আপনি সারা দেশের চোরকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, তাদের ইণ্টেলিজেন্সকে ঠাট্টা করেছেন কিনা?—ভূতের গলা খুব কঠোর বলে মনে হল।

—আজ্ঞে, তাও করেছি। এবার গড়াগড়ি হাই তুললেন এবং মুখের কাছে তুড়ি দিলেন একটা।

—প্রবন্ধের শেষে আপনি বলেছেন যদি কোনো চোর আলমারী থেকে সেই টাকা গায়েব করতে পারে, তা হলে বেলা তিনটের সময় আপনি গড়ের মাঠে গিয়ে গুনে গুনে একষট্টিটা ডিগবাজী খাবেন। আপনাকে সেই সুযোগ দিতেই আমি এসেছি। মানে আমি—ভূত আবার ঘঙর ঘঙর করে কাশতে লাগল।

—না মশাই, আপনার কাশিটা আদৌ ভালো ঠেকছে না। আমার টেবিলে বাসকের সিরাপ আছে। অনুমতি করেন তো উঠে এক ডোজ খাইয়ে দিই আপনাকে।

—থামুন, সিরাপে আমার দরকার নেই।—ভূত ধমকে বললে, যেখানে আছেন সেখানেই চুপ করে বসে থাকুন। আর শুনুন। কালকেই তা হ'লে গড়ের মাঠে ডিগবাজী খাওয়ার জন্যে তৈরী হোন। আপনার মতো একটা বেঁটে আর ভূঁড়ো লোক হাফপ্যাণ্ট পরে ডিগবাজী খাচ্ছে—এটা দেখতে আমার খুবই ভালো লাগবে। অবিশ্যি দর্শকদের ভেতরে আমায় আপনি চিনতে পারবেন না।

—তার মানে আমার দশ হাজার টাকা এখন আপনার পকেটে?

—নির্ঘাৎ।

—আর আমার রিভলভার দুটো?

—আমার দু হাতে। আপনার দিকেই তাক করে রয়েছি। হা—হা—কিন্তু ভূত বেশিক্ষণ হাসতে পারল না, আবার ঘুঙ ঘুঙ করে কেশে ফেলল।

—উঃ, আপনার কাশিটা তো—

—শটাপ্—ভূত রেগে বললে, কাশির কথা ফের বলবেন তো আমি ধড়াম্ করে একটা গুলি ছুঁড়ে দেব।

—রিভালভার ছুঁড়তে জানেন তো? শেষে গুলিও লাগবে না আপনিও খামোকা গুঁতো গাঁতা খাবেন।

—স্টপ! আমি রিভালভার ছুঁড়তে জানি না? হা—হা—হা—ঘঙর ঘঙর ঘঙ-ঘঙ—

—উঁহু আপনার কাশি—না মশাই, আমি উইথড্র করছি। মানে কথা হল, আপনি তা হলে ভূত নন?

—না।

গড়াগড়ি উদাসস্বরে বললেন, ভারী নিরাশ হলুম। অনেক দিন ধরেই ভূতের সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে আমার ছিল, কিন্তু দেখছি, বরাতটাই খারাপ। তা হলে আপনি কে?

—আমি? হা—হা—হা—ঘঙর ঘঙর ঘঙ!

—ঘঙর ঘঙর ঘঙ? যে রকম কাশছেন, আপনাকে কাশীবাবু বলা যেতে পারে।

—শটাপ্ আই সে!—ভূত চটে বললে, বেশি জ্যাঠামো করবেন না আমি কে জানেন? এডোয়ার্ড হরিপদ মোল্লা।

অ্যাঁ! আপনি তবে সেই বিখ্যাত—

হ্যাঁ, সেই বিখ্যাত এডোয়ার্ড হরিপদ মোল্লা লোকে যাকে সংক্ষেপে এডো হরি বলে থাকে। পাকিস্তানে যে হরি মোল্লা। গত ছয় মাসে আমি দিল্লী-কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজ-ঢাকা-করাচী-রাওলপিণ্ডিতে একুনে বাহাত্তরটা চুরি করেছি। ভারত-পাকিস্তানের সব পুলিশকে স্রেফ ঘোল খাইয়ে দিয়েছি।

—কী সৌভাগ্য, কী সৌভাগ্য!—বক্রেশ্বর গড়গড়ি বিনয়ে গলে গেলেন: আমি ভাবতেই পারিনি যে আমার এই গরিবের কুঁড়েতে আপনার মতো মহাজনের পায়ে ধুলো পড়বে। এখন কী দিয়ে আপনাকে আপ্যায়ন করি বলুন তো? আমার এই ঘরেই ল্যাম্প আছে, আপনাকে এক পেয়ালা কফি করে দেব কি? ভাঁড়ারের ফ্রিজিডিয়ারে সের দুই কড়াপাকের সন্দেশ আছে—তাই কি এনে দেব এক প্লেট?

—কিচ্ছু করতে হবে না আপনাকে—এডো হরি বললে, রাত দেড়টায় কফি খাওয়ার মতো বাজে অভ্যেস আমার নেই। আর কড়া পাকের সন্দেশের

কথা যদি বলেন, আপনি ভদ্রতা করবার আগেই ফ্রিজিডিয়ার খুলে সেটা চেখে এসেছি। বেড়ে সন্দেশগুলো। তবে সবটা খাইনি—আপনার জন্যে দেড়খানা আমি রেখে দিয়েছি।

—হ্যাঁ, কী মহাশয় লোক আপনি। কী স্বার্থত্যাগ!

—তা বলতে পারেন। আমি বিবেচনা করেই কাজ করি। আপনার আলমারীতে একখানা দু টাকার নোট রয়েছে দেখতে পারেন। কালকের বাজার খরচা। সকালে উঠেই লোকের কাছে ধার করতে বেরুবেন, এ আমার পছন্দ নয়। খঙ-ঘঙ-ঘঙ।

অভিভূত হয়ে গড়গড়ি বললেন, কী বিবেচনা। সত্যি বলছি আপনার মতো এমন বিবেকবান এমন চরিত্রবান চোর আমি কখনো দেখিনি কাশীবাবু।

—শটাপ্।—এডো হরি চেঁচিয়ে বললে, আমার নাম খারাপ করবেন না। আমি কাশীবাবু নই।

—তবে কি গয়া বাবু? না—না—সরি, আপনি হচ্ছেন এডোয়ার্ড হরিপদ পাল্লা।

—পাল্লা নয়, মোল্লা।

—সরি, মোল্লা। জানেন, মোল্লা শুনেই আমার মোল্লাচকের দইয়ের কথা মনে পড়ে। বেড়ে জিনিষ। খেয়েছেন কখনো?

—না, খাইনি।—এডো হরি একটু উৎসাহিত হলেন: আছে নাকি আপনার ফ্রিজিডিয়ারে? কই, দেখিনি তো? কয়েকটা চিংড়ি মাছ আর মূলো ফুলো কী দেখলুম, কিন্তু দই তো—

—দই নেই, থাকলেও আপনাকে খেতে বারণ করতুম। আপনার যা কাশির ধাত—রাতে দই খাওয়া আদৌ ঠিক নয়।

—থামুন, বার বার কাশি কাশি বকবেন না। ওতে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। শুনুন, আপনাকে আমি বলতে চাই যে এইবারে আমি পাশের এই জানালাটি দিয়ে চলে যাব। আপনার দশ হাজার টাকার জন্যে ধন্যবাদ, আর রিভালভার দুটোও আমি রাখলুম—আমার কাজে লাগবে। ভালো কথা—কাল তিনটের সময় গড়ের মাঠে যাচ্ছেন তো?

—যেতেই হবে, উপায় নেই তো।—বক্রেশ্বর গড়গড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন: আমি ভেবেছিলুম ছিঁচকে চোরদের নিয়ে একটু রগড় করব,

কিন্তু স্বয়ং চোর-সম্রাট আপনি এসে পড়বেন—সেটা বুঝলে কি আর ওসব ধাষ্টামো করতে যাই। তা দয়া করে একটা উপকার যদি—

—কী উপকার?—এডো হরি প্রসন্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

—আপনি আমার মোটা গদীওয়ালা ডেক চেয়ারটাতেই বসে আছেন তো?

—নিশ্চয়। খুব ভালো চেয়ার মশাই—বসে যা আরাম। নেহাৎ পেল্লায় বড়ো—নইলে কাঁধে করেই নিয়ে যেতুম।

—হেঁ—হেঁ—ধন্যবাদ। তা একটা কাজ করবেন? চেয়ারের পাশেই টিপয়ের ওপর টেলিফোন আছে। মানে টিপয়সুদ্ধ ফোনটা যদি এগিয়ে দিতে পারেন, তা হলে আমি লালবাজারে একটা খবর দিতুম।

—লালবাজারে কেন?

—বারে, তারা তো আপনাকে অনেকদিন ধরে খুঁজছে কিনা—একবার দেখতে পেলে ভারী খুশি হত।

—তাই নাকি? হা—হা—ঘঙ—ঘঙ—ঘঙ—এক সঙ্গেই হাসলেন আর কাশলেন এডোয়ার্ড হরিপদ মোল্লা: তাদের খুশি করতে আমার মোটেই ইচ্ছে নেই—বুঝলেন না? আর সারাদিন চোর টোর ধরে বাছারা এখন ঘুমুচ্ছে, এত রাতে আর তাদের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে কী লাভ? তা ছাড়া, টেলিফোনের লাইনটাও আমি কেটে রেখেছি।

—কেটেছেন নাকি? তা হ'লে কী আর হবে! ভাঁড়ারের কাবার্ডে আর একটা লুকোনো ফোন আছে—সেইটে দিয়েই একটা রিং করি, আর নীচের সুইচটাও খুলে দিয়ে আসি।

—অ্যাঁ—ভাঁড়ারের কাবার্ডে! ফোন আছে?—এডোয়ার্ড হরিপদ মোল্লা লাফিয়ে উঠতে গেলেন এবং পরক্ষণেই দারুণ একটা চিৎকার ছাড়লেন: একি!

এবার বজ্রেশ্বর গড়গড়ি গোঁফে তা দিলেন। বললেন, ও কিছু না। চেয়ারটাকে আপনি পছন্দ করেছেন, চেয়ারটারও খুব পছন্দ হয়েছে আপনাকে! ঘাড়ে আপনি বসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে দু'পাশ থেকে দুটো লোহার হাতল এসে বেড়ীর মতন আপনার কোমর আটকে ধরেছে, সকালে কামার না এলে ও আর খোলা যাবে না।

—অ্যাঁ!

—আজ্ঞে, এই সব নিয়েই তো আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা। ওই চেয়ারটা যে আমি স্পেশ্যালি আপনার জন্যেই তৈরী করেছি।

—আমার জন্যে।—বাইরের মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঠেছিল, তার আলো পড়েছিল ঘরে। সেই আলোয় এডো হরির ঝিঙের মতো মুখখানা দেখতে পেলেন গড়গড়ি। এডো হরি খাবি খেয়ে আবার বললেন, আমার জন্যে ?

—কী করা যায়, বলুন। লালবাজার কিছুতেই আপনাকে কায়দা করতে না পেরে আমার শরণ নিয়েছিল, শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের কর্তব্য হিসেবে আমি মাঝে মাঝে তাদের সাহায্য করে থাকি। তাই আপনার জন্যেও কিছু আয়োজন আমি করে রেখেছি। ওটায় না বসে আপনি যদি টুলটায় চাপতেন, তা হলে হঠাৎ সেটার মাঝখানে ফাঁক হয়ে আপনি গলে যেতেন বস্তাবন্দীর মতো। যদি মোড়ায় বসতেন, চারদিক থেকে চামড়ার বেল্ট নাগপাশের মতো আষ্টে পৃষ্টে বেঁধে ফেলত আপনাকে। ডেক চেয়ারে বসেই ভালো করেছেন—সব চাইতে আরামেই রয়েছেন আপনি—

হরি মোল্লা আর্তনাদ করলেন ঃ আমার দু হাতে দুটো রিভালভার—গুলি করব—

—টয় পিস্তল, ফুট করে আওয়াজ হবে কেবল। শুনুন, প্রবন্ধটাও আপনার আশাতেই লেখা—জানতুম চ্যালেঞ্জ আপনি নেবেনই। তা আপনি আরাম করে বসুন—আমি ফোনটা করে আসি, সুইচটাও খুলে দিই—গরমে প্রাণ গেল মশাই!

উত্তরে হরি মোল্লা ঘঙ—ঘঙ—ঘঙর—ঘঙর করে কাশলেন।

—উঃ আপনার এই কাশিটা আদৌ ভালো নয়, টি-বি, ফি-বি হয়ে যেতে পারে। এক ডোজ সিরাপ না খাইয়ে কিছুতেই লালবাজারে আপনায় আমি যেতে দেব না কাশীবাবু—এই বলে বজ্রেশ্বর গড়গড়ি ভাঁড়ারের দিকে পা বাড়ালেন।

নাটক
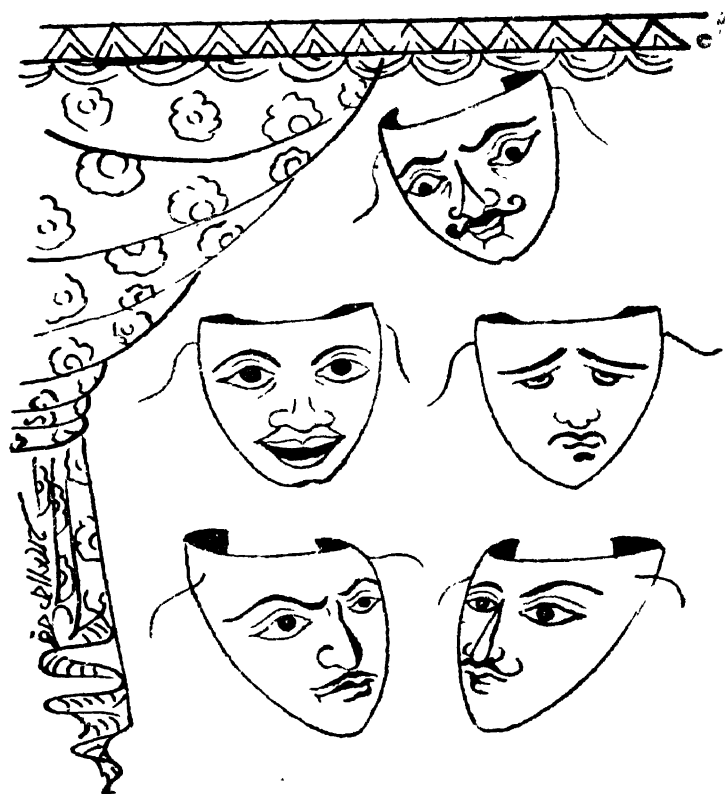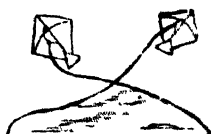
বিশ্বকর্মার ঘুঁড়ি

[নন্দদুলাল বাবু খাটে তাকিয়া ঠেশান দিয়ে ঘুমুচ্ছেন ; গুরগুর করে তাঁর নাক ডাকছে। গুটি-গুটি পায়ে ঝণ্টুর প্রবেশ]

ঝণ্টু ॥ বাবা—বাবা—

[নন্দদুলালবাবুর নাক ডাকতে লাগল]

ও বাবা—শুনছ ?

নন্দ ॥ (নাকের ডাক বন্ধ হল ; কিন্তু চোখ খুললেন না) উঁ ?

ঝণ্টু ॥ ঘুঁড়ি।

নন্দ ॥ ঘড়ি ? ঘড়ির দোকান তো আপনাদেরই জন্যই স্যার। বলুন—কী চান। ওয়াল ক্লক, টাইমপিস, রিষ্টওয়াচ—সব পাবেন।

(ঘুমুতে লাগলেন)

ঝণ্টু ॥ কী মুস্কিল ! আমি তোমার ঘড়ির দোকানের খদ্দের নই বাবা। আমি ঝণ্টু।

নন্দ ॥ (ঘুমুতে ঘুমুতে) কে—মণ্টু বাবু ? না স্যার, আপনার ঘড়িটা এখনো অয়েল করা হয় নি। পরশু পাবেন।

ঝণ্টু ॥ আঃ এতো ভারী জ্বালা হলো ! এই ভর দুপুর বেলা বাবা কেমন করে যে এতো ঘুমোয় ! বাবা—অ—বাবা, শুনছ ? মণ্টু বাবুর ঘড়ি নয়—বিশ্বকর্মা পূজোর ঘুঁড়ি !

নন্দ ॥ বিশ রকমের ঘড়ি ? বিশ রকম কী বলেন স্যার—ত্রিশ রকম আছে আমার কাছে। অল্ জুয়েলস্ সুইস মেইড—

ঝণ্টু ॥ নাঃ আর তো পারা যায় না ! (ধাক্কা দিয়ে) আঃ একটু জাগোই না বাবা। তুমি এখন তোমার ঘড়ির দোকানে বসে নেই—বাড়ীতে শুয়ে আছো, আর তোমার ছেলে ঝণ্টু ঘুঁড়ি চাইছে। অ বাবা (ধাক্কা দিলে

[নন্দবাবু জেগে এবং রেগে উঠে বসলেন]

নন্দ ॥ কী হয়েছে রে ঝণ্টে—অ্যাঁ? ভেঙে দিচ্ছিস কেন কাঁচা ঘুমটা? মারব এক থাপ্পড়!

ঝণ্টু ॥ থাপ্পড় না! ঘুঁড়ি।

নন্দ ॥ ঘুঁড়ি?

ঝণ্টু ॥ কাল যে বিশ্বকর্মা পূজো!

নন্দ ॥ বিশ্বকর্মা পূজো তো তোমার কী?

ঝণ্টু ॥ আমি ঘুঁড়ি ওড়াব না?

নন্দ ॥ মানে? সকাল থেকে ছাদের ওপর দাপাদাপি করবে—না? হতভাগা গাধা! লেখা নেই, পড়া নেই, কেবল ঘুঁড়ি? আর সাতদিন পরে না তোর হাপইয়ার্লী পরীক্ষা?

ঝণ্টু ॥ ও ঠিক পাশ করে যাব, তুমি দেখে নিয়ো।

নন্দ ॥ দেখে নেব? নতুন করে কী দেখব—অ্যাঁ? অঙ্কে বারো, ইংরেজীতে সাত, ভূগোলে গোল্লা—

ঝণ্টু ॥ এবার আশী নব্বুই করে পাব বাবা—ঠিক বলছি তোমাকে। কালকে ঘুঁড়ি ওড়ালে বিশ্বকর্মা ঠাকুর আশীর্বাদ করবেন দেখো।

নন্দ ॥ তোকে আশীর্বাদ করতে বিশ্বকর্মার বয়ে গেছে। ঘুঁড়িটুড়ি হবে না। যা—বেরো এখান থেকে। ঘুমুতে দে এখন—

(আবার শোবার উপক্রম করলেন)

ঝণ্টু ॥ বাবা—

নন্দ ॥ উঃ, মাথা ধরিয়ে দিলে তো! কাঁচা ঘুম ভেঙে শরীরটা একেবারে হাঁইফাঁই করছে। যা বলছি ঝণ্টে। ঘুমুতে দে একটুখানি—

ঝণ্টু ॥ ঘুঁড়ির পয়সা না দিলে তোমায় ঘুমুতে দিচ্ছি না—হুঁ হুঁ!

নন্দ ॥ আচ্ছা উনপাজুড়ে ছেলে তো! হাড়ে দেখছি দুব্বো গজিয়ে দিলে! (তাকিয়ার তলা থেকে একটা দু'আনী ছুঁড়ে দিলেন) নে পালা!

ঝণ্টু ॥ (কুড়িয়ে নিয়ে) মোটে দু' আনা?

নন্দ ॥ দু' আনা না তো দুশো টাকা দিতে হবে নাকি তোমায়? বেরো—

ঝণ্টু ॥ দু' আনায় তো মোটে দুখানা ঘুঁড়ি হবে বাবা! অন্তত বারোখানা ঘুঁড়ি চাই, আট আনার মাঞ্জা—

নন্দ ॥ এবার দেখছি তোর কানে মাঞ্জা দিতে হবে ভালো করে! বেল্লিক-গাধা। ঘুঁড়ি উড়িয়েই তুমি আমার সর্বস্ব ফুঁকে দেবার তাল করেছ—

না? বেরো বলছি—(ঝন্টু যায় না)—নিকালো! (ঝন্টু যায় না)—তবে রে হতচ্ছাড়া—(তাকিয়া ছুঁড়ে মারলেন, লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। ঝন্টুর পলায়ন।)

॥ দুই ॥

[পার্ক। উদাসীন ঝন্টু একটা বেঞ্চে আসীন।]

ঝন্টু ॥ ধেৎ—দু' আনায় কি ঘোড়াড্ডিম হবে! ও তো চানাচুর আর ফুলুরি খেলেই খতম! বাবা কী ভীষণ কিপ্‌টে! নাঃ—এবার আর বিশ্বকর্মা পুজোয় ঘুঁড়ি ওড়ানো হল না দেখছি! মন-টন এমন যাচ্ছেতাই লাগছে যে এখন আমি যাকে তাকে খিঁমচে দিতে পারি।

[এক ভদ্রলোক আর তার পেছনে বারো তেরো বছরের একটি ছোকরার প্রবেশ]

ছোকরা ॥ বাবু বাবু—

ভদ্রলোক ॥ কী হয়েছে, জ্বালাচ্ছিস কেন?

ছোকরা ॥ অনাথ বালক বাবু, খেতে পাই না—যদি চারটে পয়সা দেন—

ভদ্রলোক ॥ তোদের জন্যে আর পারা যায় না। (পকেট থেকে চারটে পয়সা বের করে দিলেন) পালা।

(ছেলেটা ছুটে চলে গেল; অন্যদিক দিয়ে প্রস্থান করলেন ভদ্রলোক। ঝন্টু সব দেখল।)

ঝন্টু ॥ (ভেবে চিন্তে) অ্যাঁ—অনাথ বালক। এও তো মন্দ নয় দেখছি। আমারও অনাথ বালক হতে বাধা কী? না—কিছু না। যার বাবা অত কৃপণ সে অনাথ ছাড়া কী আর। ধরো আমিও যদি অনাথ হয়ে যাই? আর যদি ষোলোজন লোকের কাছ থেকে এক আনা করে পাই—? দি আইডিয়া। তা হলে পুরো একটা টাকা। আর ছাদের ওপর মনের আনন্দে—ভো-কাট্টা—ভোম্মারা—

(একটু ভাবল)

কিন্তু ও ছেলেটা সত্যিই গরীব—জামা-টামা ছেঁড়া। আমাকে বিশ্বাস করবে লোকে? তা হলে আমিও জামা ছিঁড়ে ফেলব নাকি? সর্বনাশ—নতুন জামা, বাবা আমারও পিঠের চামড়া ছিঁড়ে দেবে। একটু ময়লা-টয়লা মেখে নেই বরং—

(উঠে দাঁড়াল; খানিক মাটি কুড়িয়ে মাখিয়ে নিলে জামায়, মুখেও মাখলে।)

বাঃ—বেশ দেখাচ্ছে! এবারে আমিও পুরো অনাথ বালক। দেখি, ঘুড়ির পয়সা আদায় করতে পারি কিনা!

[একজন বুড়ো মতন পথিক ঢুকলেন। হাতে ছড়ি, ঝণ্টু এগিয়ে গেল]

দাদু! ও দাদু—

বৃদ্ধ॥ (বোঝা গেল, ভালো দেখতে পান না) কে র‍্যা, হেবো নাকি? হাঁরে হতচ্ছাড়া ছেলে, তোকে আমি কব্‌রেজের কাছে চ্যবনপ্রাশ আনতে পাঠালুম—আর তুই এখানে বসে আড্ডা মারছিস? একটু আক্কেল নেই বাঁদর কোথাকার?

[বলেই ধাঁ করে ঝণ্টুকে এক ছড়ির ঘা]

ঝণ্টু॥ উরেঃ বাপ—গেছি-গেছি—

বৃদ্ধ॥ গেছিস? এখুনি যাবি কোথায়? তোর হাড়-মাস আলাদা করে—(আবার ছড়ি তুলে হাত নামালেন) উঁহু, এতো হেবো নয়! ছ্যা ছ্যা—এ আমি কাকে মারলুম।

ঝণ্টু॥ (করুণ স্বরে) একটি অনাথ বালককে মারলেন দাদু। খেতে পাই না—তাই চারটে পয়সা চাইছিলুম—

বৃদ্ধ॥ এহে-হে—তাই তো। ভারী অন্যায় হয়ে গেছে যে। কিছু মনে কোরো না বাপু—চোখে তো ভালো দেখি না, ভেবেছিলুম, আমার বিশ্ববকাটে নাতিটা বুঝি এখেনে বসে আছে। এই নাও—কিছু কিনে খেয়ো—

(ঝণ্টুর হাতে কী একটা গুঁজে দিয়ে প্রস্থান)

ঝণ্টু॥ নিশ্চয় একটা সিকি-টিকি দিয়েছে—সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। মার দিয়া কেল্লা—(মুঠো খুলে) অ্যাঁ, একটা নয়া পয়সা? বলে গেল, এ দিয়ে কিছু কিনে খাব? এ যে দেখছি বাবার ওপরেও এক কাঠি। (খানিকক্ষণ ব্যাজার হয়ে পয়সাটার দিকে চেয়ে রইল) সবাই যদি ছড়ি পেটা করে একটা করে নয়া পয়সা দিয়ে যায়, তা হলে একশো নয়া পয়সা যখন পাব তখন যে একখানা হাড়ও আস্তো থাকবে না। ওঃ—লোকটা কী ঘুঘু!

(একটু ভাবল)

নাঃ—দুনিয়ায় দয়ালু মানুষও নিশ্চয় দু' চারজন আছে। ওই তো হাসি হাসি চেহারার একজন আসছে! ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে—মনটা

নির্ঘাত ওর কুসুমের মতো কোমল। দেখি চেষ্টা করে—(কোট প্যাণ্ট পরা গোলগাল চেহারার এক ভদ্রলোকের প্রবেশ ; ঝণ্টু কাছে গিয়ে ডাকল) স্যার—শুনছেন ?

স্যুটপরা লোক ॥ (থেমে) কী চাই তোমার ?

ঝণ্টু ॥ আমি একজন অনাথ বালক স্যার। সংসারে আমার কেউ নেই। যদি দয়া করে চারটে পয়সা সাহায্য করতেন—

(স্যুটপরা লোক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ঝণ্টুর দিকে তাকালেন)

স্যুটপরা ॥ (আস্তে আস্তে) তা বটে। তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়, তুমি অনাথ। আহা-হা, কী কষ্ট তোমার। (ঝণ্টুর মনে আশা হল)

ঝণ্টু ॥ তা হলে স্যার দয়া করে একটা টাকাই দিন। গরীব মানুষ—কিছু খেয়ে বাঁচি।

স্যুটপরা ॥ আহা, দেবই তো। তোমাকে না দিলে আর কাকে দেব। (খপ্ করে ঝণ্টুর একটা হাত ধরলেন) চলো আমার সঙ্গে—

ঝণ্টু ॥ হাত ধরলেন কেন স্যার ? কোথায় নিয়ে যাবেন ?

স্যুটপরা ॥ যেখানে তোমার খাওয়া-দাওয়ার ভালো ব্যবস্থা হবে। বেশি দূরে নয়—ওদিকে ওই লাল বাড়ীটা দেখতে পাচ্ছ না ? ওখানে।

ঝণ্টু ॥ অ্যাঁ ! ওটা যে—

স্যুটপরা ॥ খুব ভালো জায়গা। ভবানীপুর থানা।

ঝণ্টু ॥ (হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে) অ্যাঁ—থানায় কেন ? না-না, আমি থানায় যাব না—

স্যুটপরা ॥ (জোরে ধরে রাখল) হ্যাঁ, থানাতেই তোমায় যেতে হবে। বিচ্ছু ছেলে কোথাকার, এই বয়সেই এমনি খলিফা হয়ে উঠেছ ? মুখে আর নতুন জামায় খানিক মাটি মেখে ভেবেছ অনাথ বালক হয়ে গেছ ? অনাথ বালক আমি চিনি না ? দুপুর বেলা বাড়ী থেকে পালিয়ে এইভাবে লোকের কাছে পয়সা নাও আর বায়োস্কোপ দেখতে যাও ? পীরের কাছে মামদোবাজি ? চলো—আজ তোমার ভিরকুট্টি ভাঙছি—

(ঝণ্টুর হাত ধরে টানাটানি।)

ঝণ্টু ॥ (চেঁচিয়ে) ছেড়ে দিন স্যার, ছেড়ে দিন—আমি পয়সা চাই না—আমি থানায় যাব না—

স্যুটপরা ॥ থানায় তোমায় যেতেই হবে।

ঝণ্টু॥ ঘাট হয়েছে স্যার—আমায় ছাড়ুন স্যার—

স্যুটপরা॥ না—ছাড়াছাড়ি নেই। তোমার একটু শিক্ষা হওয়া দরকার।

[ছাতা হাতে একটি প্রৌঢ়ের প্রবেশ। চোখে চশমা, মাথায় টাক—কাঁধে কোটের ওপর চাদর]

প্রৌঢ়॥ কী হয়েছে? এই ছোট ছেলেটার ওপর উৎপীড়ন করছেন কেন?

ঝণ্টু॥ (ভয়ে আধখানা হয়ে গিয়ে) অ্যা—কী সর্বনাশ। এ যে—(পালাতে প্রাণপণ চেষ্টা, কিন্তু ভদ্রলোক বজ্রমুষ্টিতে তাকে ধরে রেখেছেন)

স্যুটপরা॥ উৎপীড়ন কি মশাই। ভদ্রলোকের ছেলে—অনাথ বালক সেজে পয়সা চাইছে। থানায় নিয়ে যাব একে।

প্রৌঢ়॥ তার মানে? ভদ্রলোকের ছেলে হলে কি অনাথ হয় না? সে কি গরীব হতে পারে না? আর সে একটা পয়সা চাইলেই তাকে থানায় দেবেন? আপনি তো অতি নৃশংস পাষণ্ড লোক দেখছি।

স্যুটপরা॥ দেখুন—

প্রৌঢ়॥ (মাটিতে ছাতা ঠুকে) অনেক দেখেছি—আপনাকে আর দেখাতে হবে না। নিষ্ঠুর হৃদয়হীন কোথাকার? ছেড়েদিন একে। (স্যুটপরা ঘাবড়ে হাত ছেড়ে দিলেন; ঝণ্টু পালাবার আগেই প্রৌঢ় তার হাত ধরলেন) আহা, সুকুমারমতি বালক—না জানি, কত কষ্টেই ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে! একবার চেয়ে দেখুন এর সরল মুখখানার দিকে—(স্যুটপরা সরে পড়েছিলেন; প্রৌঢ় এবার চেয়ে দেখলেন ঝণ্টুর মুখ) অঁা—এ যে ঝণ্টে। নন্দবাবুর ছেলে ঝণ্টে!

ঝণ্টু॥ (কেঁদে ফেলে) স্যার!

প্রৌঢ়॥ (ভেংচে) স্যার! আমি সাক্ষাৎ স্কুলের হেড মাস্টার—আর আমার চোখের সামনে তুমি অনাথ বালক হয়েছ। তোমার বাবার নিজের বাড়ী, অত বড় ঘড়ির দোকান—তুমি অনাথ? দাঁড়াও—এক্ষুনি তোমায় নাথ করে দিচ্ছি—। গাধা গর্দভ-রাসভ-ভল্লুক-উল্লুক—

(দমাদম শব্দে ছাতা দিয়ে পিটতে আরম্ভ করলেন ঝণ্টুকে)